দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি

প্রকাশক : শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায়
নবার্ক
ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর,
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২

মুদ্রক : শ্রী অসীম সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে-১
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পরলোকগমনে জ্ঞানবিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র জগতের পক্ষে যে ক্ষতি হইল, তাহা উপস্থিত কিছুকালের জন্য অনপনেয় রহিল, এবং ভবিষ্যৎ বহু বৎসর ধরিয়া তাহা দুরপনেয়ই থাকিবে। তিনি মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, এবং যে-কার্য তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা তিনি করিয়া উঠিবার সময় পাইলেন না তাহার বিচার করিলে আমাদের বলিতে হয় যে ইহা অকাল-মৃত্যুই হইয়াছে। পরিপূর্ণ এবং পরিণত মানসিক শক্তির অধিকারী আশী ও তদূর্ধ্ব বয়সের জ্ঞান-তপস্বী আমাদের দেশে বিরল নহেন ; এবং এই হেতু আমাদের মনে এই অকাল-মৃত্যুর জন্য পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কথা এবং জাতির কথা ভাবিয়া নিরুপায় হাহাকার জাগিয়া উঠে। ইহার উপর এই অকাল-মৃত্যুর কারণ পরিবার-গত ও মিত্রগোষ্ঠীগত অনপনেয় শোক তো আছেই।

বাঙ্গালাদেশে ও ভারতবর্ষে পণ্ডিত ও গবেষকের অভাব নাই, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পাণ্ডিত্যের বস্তু এবং প্রকাশ উভয় দিকেই একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। Indology বা প্রাচীন ভারত-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া বহু ধুরন্ধর পণ্ডিত আমাদের দেশে ও অন্যত্র কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের নাম অনায়াসে করা যায়। কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র নিজের বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সেটী অনন্যসাধারণ, সেটী হইতেছে ভারত ও চীনের সম্পর্ক। চীন-বিদ্যা ও ভারত-বিদ্যা, এই উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিল প্রবোধচন্দ্রের বিদ্বত্তা। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরু ফরাসী আচার্য Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং Paul Pelliot পোল পেলিও প্রভৃতি অন্য কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভাবশিষ্যও তিনি ছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারত ও চীন এই দুইটী বিরাট সভ্যতার সংযোগের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করার কার্যে যে যোগ্যতা ও যে অধিকার অপেক্ষিত, তাহা সর্বজন সুলভ নহে। একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহিত এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপেক্ষিত, অন্যদিকে তেমনি চীনাভাষাতে কাজ-চালানো দখল থাকা দরকার ; এবং চীনা লিখিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইহার দুরূহতার কথা চিন্তা করিলে. এই কাজ-চালানো দখল, অর্থাৎ কম-পক্ষে আড়াই-তিন হাজার বিভিন্ন Character বা অক্ষরের সহিত পরিচয়, সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এতদ্ভিন্ন, ইংরেজী ছাড়া উপরন্তু অন্ততঃপক্ষে ফরাসী ও জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য। তদুপরি সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের রাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ভাল করিয়া জানা দরকার। চীনার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ জাপানী ভাষার জ্ঞানও কখনও-কখনও অপরিহার্য হইয়া উঠে। তিব্বতীর সহিত, বিশেষ

করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মের আলোচনার জন্য, পরিচয়ও আবশ্যক হয়। এবং এই সমস্ত ভাষা-বিষয়ক বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, অবান্তর বিষয় বর্জন করিয়া মুখ্য বিষয় ধরিয়া লইবার শক্তি সংস্কৃতি-পূত মনোভাব এবং সব কথা নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়া সহজ ও সার্থকভাবে তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিবার মত প্রাঞ্জল লিখন-শৈলী, এগুলিও থাকা চাই।

ভারত ও চীনের সংযোগ সম্বন্ধে ও এশিয়া-খণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আলোকপাত করিবার কার্যে এই সমস্ত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রবোধ-চন্দ্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম চীনবিদ্যাবিৎ। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, দুইজন ভারতীয় পণ্ডিত প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া চীনদেশে হান্-বংশীয় সম্রাটের রাজধানী লো-য়াঙ্-এ উপনীত হন, ইঁহাদের নাম হইতেছে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ। চীনদেশে পহুঁছিয়াই ইঁহারা ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করিতে আত্মনিয়োজিত হইলেন। এইভাবে ইঁহারা ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত করিলেন, তাহা ১২০০/১৩০০ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রহিল। ইঁহাদের প্রবর্তিত ধারা বা পরম্পরার মধ্যে আসিলেন, একদিকে বহু বহু ভারতীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী, যাঁহারা চীন-দেশে গিয়া চীনা ভাষা আয়ত্ত করিলেন এবং চীনা পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধশাস্ত্র ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করিলেন, ক্বচিৎ বা নূতন গ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চীনদেশেই রহিয়া যান, এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন; অন্যদিকে তেমনি বহু চীনা জিজ্ঞাসু এই ধারার মধ্যে দেখা দিলেন, বুদ্ধ-বচন সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা ভয়াবহ বিপৎসমূহকে উপেক্ষা করিয়া ভারতে আসিয়া ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিবার ও চীনা ভাষায় অনুবাদ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং মাতৃভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র সহজ-লভ্য করিবার কার্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন, ও তাঁহাদের ভারতীয় গুরু ও অগ্রগামীদের মত এই কাজে জীবনপাত করিলেন। কুচা-নগরীর কুমারজীব, দক্ষিণ ভারতের বোধিধর্ম, চীনদেশের ফা-হিয়েন, হিউএন-থ্ সাঙ ও ঈ-ত্সিঙ— ইঁহাদের নাম এই সম্পর্কে প্রথম করিতে হয়। কালক্রমে ভারতবর্ষ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইল, ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতের সঙ্গে চীনের সাক্ষাৎ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। পণ্ডিতের আদান-প্রদান কয়েক শতক ধরিয়া প্রায় বন্ধই রহিল। চীনের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নির্বাপিত হইল, চীনদেশেও সংস্কৃত-চর্চা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে তবুও ভারতের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত রহিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয় পণ্ডিতের চীন-ভাষায় বিদ্বত্তার কাহিনীর স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

পুনরায় ইউরোপের পণ্ডিতদের চেষ্টায় চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনাকে আশ্রয় করিয়া ভারত ও চীনের এই প্রাচীন সংযোগের কথা আবার জনসমক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল। ইউরোপীয় চীন সংস্কৃতিবিৎ পণ্ডিতেরা চীনা গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন,

ফরাসী, জর্মান, ইংরেজীতে ; আমাদের দেশেও ক্রমে চীন ও ভারতের পুরাতন কল্যাণ-মিত্রতার কথা আসিয়া পঁহুছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের আধারে আমাদের দেশের জিজ্ঞাসুদের মধ্যে এই চীন-ভারত-সংবাদ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, এবং চীনা ভাষার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য কিছু পরিমাণ আগ্রহও দেখা দিল। আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার চর্চার আবশ্যকতার কথা আমাদের শিক্ষা-নেতাদের কাহারও-কাহারও মনে জাগরিত হইল। চীনা ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে দুই কারণে ; এক— প্রাচীন ভারতকে আরও ভাল করিয়া বুঝিবার সাধন হিসাবে ; এবং দুই— প্রতিবেশী সুপ্রাচীন সুসভ্য চীনকেও বুঝিবার জন্য।

এযুগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে প্রথম চীনা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে— বোধহয় ১৯১৭ সালে তিনি চীন হইতে প্রত্যাগত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই চীনা ভাষা পাঠের জন্য আমি অন্যতম ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ক্লাস বেশী দিন চলে নাই— ছাত্রের অভাবে। ইহার পূর্বে, ১৯১৫র পূর্বে, বিখ্যাত নানাভাষাবিৎ হরিনাথ দে নিজগৃহে চীনা ভাষার শিক্ষক রাখিয়া চীনার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছিলাম। মির্জাপুর ও পাটনার ব্যারিস্টার, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জায়সবাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে অবস্থানকালে চীনা-ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া এক বৎসরের জন্য একটী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তিনি কিন্তু আর অগ্রসর হন নাই। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি চীনা ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক সিল্ভ্যাঁ লেভি পারিস হইতে বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক রূপে আগমন করিলেন, এবং তাঁহার বিশ্ব-ভারতীতে অবস্থান ভারতে চীনা ভাষায় চর্চার পক্ষে বিশেষ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আনিয়া দিল। চীনা ও তিব্বতী উভয় ভাষার শিক্ষা আরম্ভ হইল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উৎসাহের সঙ্গে এই দুই ভাষা অধ্যয়নে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মীদের কেহ কেহও যোগদান করিলেন।

অধ্যাপক সিল্ভ্যাঁ লেভির শুভাগমনে চীনাভাষার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা কার্যকর হইল প্রবোধচন্দ্রের জীবনে। ইহার স্থায়ী ফল ইহাই হইল যে, এই যুগে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, ভারতবর্ষ প্রবোধচন্দ্রকে পাইয়া বিশ্বের চীনবিৎ পণ্ডিতদের সভায় নিজ গৌরবের আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। এযুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চীনবিৎ রূপে প্রবোধচন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। এবং কেবল তাহাই নহে। বিশেষ মূল্যবান গবেষণার দ্বারা তিনি ভারতের পক্ষে এই নূতন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একটী অনপেক্ষিক দিকে আধুনিক ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের জীবন সাধারণ বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োজিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতের জীবন, ইহাতে ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে ভ্রমণ ব্যতীত লক্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঘটনা বা কার্যাবলী আর কিছুই নাই। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র যশোহর জেলার শ্রীকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল খুলনা জেলায়।

যথারীতি স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৮ সালে ইনি বি-এ পাস করেন এবং ১৯২০ সালে "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিজ অধীত বিদ্যায় লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। বৌদ্ধ-ধর্ম ও চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৯২১ সালে স্যর আশুতোষ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, এবং এইরূপে বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মেধাবী পরিশ্রমী এবং নীরব-কর্মী শিষ্যকে পাইয়া অধ্যাপক লেভির মত পণ্ডিত বিশেষ প্রীত হন, এবং নিজ মানসিক ও চারিত্রিক গুণে ও চরিত্র-মাধুর্যে লেভি-দম্পতীর নিকট প্রবোধচন্দ্র পুত্রবৎ স্নেহ ও অনুকম্পা লাভ করেন। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে যতগুলি ভারতীয় ছাত্রের পরিচয় হইয়াছিল, ছাত্রবৎসল লেভির কাছে সকলেই প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্র ইঁহাদের সকলের চেয়ে লেভির প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। প্রবোধের সহিত সাক্ষাৎ আচরণে ও প্রবোধ সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখে আচার্য লেভির এই প্রগাঢ় স্নেহের বহু নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি, ওদিকে প্রবোধেরও গুরুর প্রতি অচলা গুরুভক্তি ছিল। ইঁহাদের গুরুশিষ্য সম্পর্ক যেন আমাদের দেশেরই মত হইয়াছিল।

অধ্যাপক লেভির আগ্রহে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সহিত ইন্দোচীনে ও জাপানে যান। কম্বোডিয়া বা কম্বুজ দেশ, আনাম বা ভিয়েৎনাম, এবং কোচিন-চীন বা প্রাচীন চম্পারাজ্য ঘুরিয়া আসিবার সুযোগ তাঁহার হয়। গুরুর নিকট এশিয়ার ইতিহাস ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একান্তভাবে উপদেশ পাইবার সুযোগ এই ভ্রমণের সময়ে তাঁহার হইয়াছিল। 'বৃহত্তর ভারত' সম্বন্ধে এইভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্য ভ্রমণের পরে, প্রবোধচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং অল্পকাল পরেই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়া পারিসে উপস্থিত হন ও সেখানে ধারাবাহিক-ভাবে গভীর নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপক লেভি ও অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত ভোট ও চীন ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ও অধীত বিদ্যায় গবেষণা করেন। ইহাঁর এই গবেষণার ফলস্বরূপ ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে তিনি *Le Canon Bouddhique en Chine* অর্থাৎ 'চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র' নামে অতি মূল্যবান গ্রন্থ, ও *Deux-Lexiqucs Sanscrit Chinois* অর্থাৎ 'দুইখানি সংস্কৃত চীনা অভিধান' নামে দুই খণ্ডে এক অভিনব গ্রন্থ, পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পেশ করেন, এবং এই দুই বইয়ের জন্য পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সুকুমার-সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ভাষাবিদ্যা ইত্যাদির জন্য সর্বোচ্চ সম্মান **Docteure's-Letters (D.-è -L.)** দক্তোর-এ-লেত্র অর্থাৎ সাহিত্যা-চার্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ফরাসী নাগরিক হইলে এই উপাধির সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী চাকরী বাঁধা থাকে। প্রবোধচন্দ্রের পূর্বে কেবল একজন ভারতীয় এই উপাধি অর্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র লইয়া ইনি কাজ করেন ; এবং প্রবোধচন্দ্রের পরে মাত্র আর একজন ভারতীয় এই মর্যাদার যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন— আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাপ্রসাদ দাশ ; ইনি ফরাসী সাহিত্যে ভারতীয় চিন্তার প্রভাববিস্তার বিষয়ে ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করেন।

এইরূপে বিদেশে নিজ পাণ্ডিত্যের জন্য জয়মাল্য অর্জন করিয়া প্রবোধচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা— ইতিহাস ও সংস্কৃতি— বিভাগে অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে তাঁহার মুখ্য কৃতি ফরাসী ভাষায় লিখিত এই দুই বই *Sino-Indica* গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই দুই বইয়ের দ্বারায় সমগ্র জগতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের প্রশংসা ধ্বনিত হয়। চীনা ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থের সূচী বহুপূর্বে জাপানী পণ্ডিত **Bunyu Nanjyo** বুন্যু নানজ্যো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন। এই সূচী বহুবৎসর ধরিয়া চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার জন্য অন্যতম মুখ্য সাধন-রূপে সমাদৃত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। নানজ্যো চীনা অনুবাদগ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত নাম ধরিয়া দেওয়াতেই এই বইয়ের ছিল প্রধান উপযোগিতা। (ফরাসী পণ্ডিত **P. Cordier** কর্দিয়ে অনুরূপভাবে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের ভোট বা তিব্বতী অনুবাদের সূচী প্রকাশিত করিয়া ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্মের চর্চার পথ সুগম করিয়া দেন।) প্রবোধচন্দ্রের মুখ্য কৃতিত্ব এখানে যে, এই সমগ্র চীনা অনুবাদরাশির একটী ইতিহাস প্রদর্শন করেন, এবং চীনা ও ভারতীয় অনুবাদকগণের কালনির্দেশ ও অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী একটী সমগ্র অনুবাদ-সাহিত্যের ইতিহাস কৌতূহলী পাঠক-সমাজের সমক্ষে ধরিয়া দেন। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক-গণ তো ভারতে আসিয়া সংস্কৃতচর্চা করিতেনই, তাহা ছাড়া চীনদেশেও সংস্কৃত অধ্যয়নের ও সংস্কৃত লেখ— ইত্যাদির লিখনের রীতি ছিল। চীনাদের সংস্কৃত শিখাইবার জন্য চীনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছোটখাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইসকল অভিধানে প্রথম দেওয়া চীনা শব্দ, ও তন্নিম্নে সেই শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ। সংস্কৃত শব্দের ভারতীয় লিপির অক্ষরগুলি চীনা লিপির অনুকরণে উপর হইতে নীচে লেখা হইত ; ও পাশে-পাশে চীনা অক্ষরে ভারতীয় বর্ণের উচ্চারণ দেওয়া হইত। এইরূপ চীনা-সংস্কৃত অভিধান হস্ত-লিখিত ও মুদ্রিত অবস্থায় চীন ও জাপান দুই দেশেই পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে জাপানে মুদ্রিত এইরূপ দুইখানি অভিধান প্রবোধচন্দ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া ও ফরাসী ভাষায় টীকা-টিপ্পনী দিয়া প্রকাশিত করেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার তথা প্রাচীন চীনা উচ্চারণের অনুশীলনে এইরূপ অভিধানের মূল্য ইহাঁর ভূমিকায় ও টীকায় সুন্দরভাবে প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। চীন ও ভারতের সভ্যতার মিলনের ইতিহাসে এইভাবে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই সার্থক গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেন।

১৯২৬ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৯ বৎসর ধরিয়া প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বালিগঞ্জ প্লেসে তাঁহার বসতবাটী তিনি প্রস্তুত করেন। এই দীর্ঘকাল প্রবোধচন্দ্রের সহকর্মীরূপে একত্র কার্য করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে অন্যত্র নানা স্থানে, প্রবোধচন্দ্রের নিজ-গৃহে, আমার গৃহে ও মিত্রবর্গের গৃহে, নানাসূত্রে প্রবোধের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি। পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল, উপরন্তু মানুষ প্রবোধচন্দ্রকে ভাল না বাসিয়া পারি নাই। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বহু বিষয়ে আমাদের একই ধরনের ছিল, উভয়েই এক হিসাবে সমানধর্মা ছিলাম। ভাষাতত্ত্বের

ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। জীবনের ও জীবনবাহ্য গভীরতম নানা বিষয়েও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। এরূপ নিরহঙ্কার অমায়িক সদাপ্রফুল্ল মানুষ দুর্লভ ছিল। পাণ্ডিত্য ইঁহার চরিত্র-মাধুর্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া বা চাপিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধের চরিত্রে একটা সহজ স্বাধীনতা ছিল, যে-জন্য তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী থাকিতে পারেন নাই। নিজের কোনও সুবিধার জন্য ক্ষমতাশালী লোকের কাছে 'দরবার' করা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একেবারেই ছিল না। এইজন্য অনেক সময়ে তাঁহার গুণ না বুঝিয়া লোকে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, প্রবোধচন্দ্র সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আমাদের মনে হয়, প্রবোধচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মূল্য কলিকাতায় আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে বা ধরিতে পারি নাই। নির্বিবাদে একাগ্রমনে ও নিজ স্বাভাবিক নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইবার অবকাশ পাইবার আশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন বা গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন।

কতকগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে প্রবোধচন্দ্র অনেকটা আশানুরূপ কার্য করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন ও চীনাভবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন ; এবং বিদ্যাভবনের নানা বিভাগে উৎসাহের সহিত গবেষণার কার্য চলিতে লাগিল। নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন কতকগুলি গবেষক দেখা দিলেন ; এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা চাহিয়াছিলেন, বিশ্বভারতী ভারতের অন্যতম প্রধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, তিব্বতী, চীনা, অবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, ফারসী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া এইরূপে ভারত-বাণীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার চীনদেশে গিয়া চীনা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য পাঁচজন ছাত্র পাঠান, তন্মধ্যে বিশ্বভারতী হইতে দুইজন ছিলেন, এবং ইঁহারা সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রকে ভারত সরকার হইতে ভারত-বিদ্যার অধ্যাপকরূপে পেকিঙ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরের জন্য পাঠানো হয়। এইরূপে চীনদেশে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া প্রবোধচন্দ্র চীনাভাষায় ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে আরও প্রাবীণ্য অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে মাও-ৎসে-তুঙ-এর অধীনে কমিউনিস্ট-তন্ত্র স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতসরকার চীনদেশে অরাজকতার আশঙ্কায় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রকে ও ভারতীয় ছাত্র কয়জনকে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পরে তাঁহাকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটী সংস্কৃতি-অনুশীলক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আর একবার কয় সপ্তাহের জন্য চীনদেশে যাইতে হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার ইতিমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরু এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম উপাচার্য হইলেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৎপরে আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধ-চন্দ্র এই গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণ করিবার জন্য নির্বাচিত হইলেন। প্রবোধচন্দ্র অনন্য-কর্মা হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার

পদের প্রাপ্য বেতন ১৫০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা কম লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্ধনের ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টিত হইলেন এবং বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

* * *

প্রবোধচন্দ্রের পুস্তক ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার সম্পাদিত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত বিশ্বভারতীর গবেষণাময় গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রধান কীর্তিস্তম্ভরূপে বিরাজ করিবে। চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র ও চীন-সংস্কৃত অভিধানের কথা বলিয়াছি। ভারতে আর্যদের আসিবার পূর্বে যে অনার্যসভ্যতা— কোল বা নিষাদ এবং দ্রাবিড় সভ্যতা— ভারতীয় সভ্যতার আধারস্বরূপ ছিল, ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সে বিষয়ে তিনজন ফরাসী পণ্ডিত Jean Przyluski ঝ্যাঁ প্‌শিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক ও প্রবোধচন্দ্রের গুরু আচার্য Sylvain Levi সিল্‌ভাঁ লেভি কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এগুলির প্রচার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। প্রবোধচন্দ্র এগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন, ও ভারতে ও এশিয়া-খণ্ডে Austric ও Austro-Asiatic (নিষাদ) ভাষাগোষ্ঠীর স্থান নির্ধারণ করিয়া একটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ও ফরাসী পণ্ডিতগণের প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে দুইটি নূতন প্রবন্ধে আরও কিছু কার্য স্বয়ং করিয়া, এবং তদ্বিষয়ে আমার রচিত একটি প্রবন্ধ লইয়া, ফরাসী হইতে অনূদিত প্রবন্ধগুলির সহিত এই চারিটি নূতন প্রবন্ধ জুড়িয়া দিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India* নাম দিয়া একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক প্রকৃতি বা আধার যে মিশ্র, আর্যানার্য, তৎসম্বন্ধে বোধ বা বিচার জাগরিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বই (ফরাসী প্রবন্ধের সংগ্রহ ও নূতন প্রবন্ধ কয়টি) অনেকটা কার্যকর হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে শাখা-সভার সভাপতি হিসাবে প্রবোধচন্দ্রের একটি মূল্যবান লেখ প্রকাশিত হয়— The Role of the Central Asian Nomads in the History of India অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতির কার্য। এই প্রবন্ধটি ভারতের ইতিহাসের একটি জটিল অধ্যায়ের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য নূতন তথ্য ও তদপেক্ষা মূল্যবান নূতন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করে। মধ্য-এশিয়ার সুগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় জাতির ভাষার আধারে গঠিত একপ্রকার প্রাকৃত ভাষাই যে ভারতে 'চুলিক-পৈশাচী' নামে অভিহিত হয়, তাহা প্রবোধচন্দ্র দেখাইয়া দেন। মহারাজা অশোকের অনুশাসন অনুশীলন করিয়া প্রবোধচন্দ্র এই অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্তে পহুঁছান যে হীনযান মতের বৌদ্ধধর্ম পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র যাহার বাহন এবং যাহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কম্বোজে এবং চট্টলে প্রচলিত তাহাই মূল বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানের মুখ্য প্রাতিপদ্য বোধিসত্ত্ববাদও বহু প্রাচীন, এবং অশোকের শিলালেখে মহাযান মতের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বোজদেশের প্রাচীন সংস্কৃত শিলালেখে উল্লিখিত কয়েকখানি সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থের পরিচয় নেপালে প্রাপ্ত পুঁথি হইতে

উদ্ধার করিয়া প্রবোধচন্দ্র তাঁহার আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধে ভারত ও বহির্ভারতের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের যোগের একাংশে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের আলোচনায়, চর্যাপদগুলির তিব্বতী অনুবাদ বিচার করিয়া চর্যাপদের পাঠনির্ণয়ের জন্য প্রবোধচন্দ্র অমূল্য উপাদান আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য সরহের কালনির্ণয়ও তাঁহার এক সার্থক গবেষণা। এদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত দোহা ও অন্য কবিতার সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে তাঁহার কৃতিত্বের মধ্যে ধরিতে হয়।

প্রবোধচন্দ্র নিছক গবেষক ছিলেন না, সাহিত্য ও কলারসিকও ছিলেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফরাসী লিখিতে পারিতেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে চীনের ও ভারতের সংযোগ সম্বন্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রচারের সম্বন্ধে তাঁহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা বইগুলি সহজবোধ্যভাবে এইসমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ভারতে ইতিহাসের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতি প্রচারের সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার বহু প্রবন্ধের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে।

প্রবোধচন্দ্র অন্যায়ের জন্য কখনও-কখনও উষ্মা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব কখনও আনয়ন করে নাই। প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে ছিল, তাঁহার সারল্যে ও ব্যবহার-মাধুর্যে সকলেই তাঁহার অনুরাগী আপনজন হইয়া পড়িত। প্রবোধের তিরোধানে আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্মরণ করিয়া মনে-মনে তাঁহার প্রতি অনুজের মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছি, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অগ্রজের উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিয়াছি।

ভারতের নিকট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে ; দর্শন পাইয়াছে, ভাস্কর্য চিত্রণ নৃত্য নাট্য প্রভৃতি নানা শিল্পকলা পাইয়াছে। ভারতের ভাণ্ডারে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাহারও অংশী হইয়াছে। ফান্‌শ্‌ বা ভারতীয় লিপিবিদ্যা চীনের মনে তাহার ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আনিয়া দিয়াছে। এসব কথা ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌গণ আমাদের জানাইয়াছেন, আমরা তজ্জন্য নূতন ভাবের গর্বমুখ অনুভব করিয়া থাকি। চীনারাও এসব কথা মানিয়া আসিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের প্রতি এজন্য এতাবৎ তাঁহাদের শ্রদ্ধাও ছিল অসীম। কিন্তু আমরা কি শুধুই দিয়াছি ? চীনের মত অতবড় সুসভ্য জাতির কাছ থেকে ভারত কি কিছুই লয় নাই ? যদি ভারত কিছুই গ্রহণ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভারতেরই মানসিক দৈন্য প্রমাণিত হইবে -- কারণ পরস্পর আদান-প্রদানের উপরই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি সম্ভবপর হয়। সুখের বিষয়, আমরাও চীনের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী— এবং এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধে আমি আমাদের সংস্কৃতির কতকগুলি দিকের উল্লেখ করি, যেখানে চীনা প্রভাব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চীন ভ্রমণকালে চীনদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি পণ্ডিতজনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি। গবেষণার সামগ্রী চীনদেশে সংগৃহীত হইয়া আছে ; চীনাদের ইতিহাস-বোধ অসাধারণ, আমাদের সংস্কৃতির মত তাহাদের সংস্কৃতি ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন নহে। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বহুবার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারও ধারণা, ভারতের সংস্কৃতিতে চীনের ছাপ আছে— ভারত ও চীনের মধ্যে, কেবল ভৌতিক বস্তু নহে, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, কলার ক্ষেত্রেও লেন-দেন উভয়ই হইয়া

গিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, চীনা ঋষি লাউ-ৎসের আলোচিত তাও-বাদ বা ঋত-বাদ অথবা নির্গুণ-সগুণ-ব্রহ্মবাদ, পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ গ্রহণ করে, এবং আমাদের তান্ত্রিক বামাচার ও অন্য গুহ্য সাধনার মধ্যে এই অর্বাচীন তাও-বাদের প্রভাব নাকি সুস্পষ্ট। মূল চীনা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহার সিদ্ধান্ত এই সম্বন্ধে যাহাতে তিনি প্রকাশ করেন সে বিষয়ে তাঁহার ও আমার উভয়েরই আগ্রহ ছিল। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে চীনা ভাষার প্রভাব স্বরূপ কতকগুলি শব্দের অবস্থান দেখা যায়। সে বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র ও আমি উভয়েই আলোচনা করিতাম। আমার ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, খোঁজ করিলে বেশ লক্ষণীয় একটা চীনা উপাদান প্রাচীন ভারতের ভাষায় মিলিবে। চীনা-সংস্কৃত অভিধানগুলি হইতে অন্তত এইরূপ একটি চীনা শব্দ খ্রীষ্টীয় ৭/৮ শতকের প্রচলিত সংস্কৃতে তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের আন্তর্জাতিক মানসিক সহযোগিতার ইতিহাসে এ সমস্ত অতি মূল্যবান তথ্য। এ কাজ তিনিই ভাল মনে করিতে পারিবেন যিনি চীনা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং অন্য ভাষা জানেন, ও যাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ আছে। প্রবোধের তিরোধানে এরূপ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কই? অবশ্য শ্রীমান্ বসন্ত বাসুদেব পরাঞ্জপে, শ্রীমান্ সতীরঞ্জন সেন প্রমুখ কতকগুলি তরুণতর ভারতীয় চীনবিৎ পণ্ডিত আছেন, ইহাঁরাই এখন আমাদের একমাত্র আশাস্থল।...

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	১৭
প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য	৩০
ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান	৩৭
গুণাঢ্যের বৃহৎকথা	৪২
মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা	৪৯
চর্যাগীতি	৫৫
দিব্য-স্মৃতি	৬৭
কবীরের সাধনা	৭৬

২

চীনাদের প্রাচীন সভ্যতা	৮৯
ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুঁনুফ	৯৫
অধ্যাপক আঁতোয়ান মেইয়ে ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব	৯৯
সিল্‌ভ্যাঁ লেভি	১০৮
আবেল বেরগেঙ ও বেদানুশীলন	১১৪
ফরাসী জীবন	১১৯
জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি	১২৭

ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ভারতীয় জাতি ও ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা হতে অতীতের অন্ধকারে যে ক্ষীণ আলোকরেখাপাত করা যায় তার সাহায্যে অনুমান করা চলে যে এ-দেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায় এবং এ-দেশের জল বায়ু ও মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত। তাদের কোনো উন্নত ধর্ম, সাহিত্য বা শিল্প ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু পঞ্চনদ হতে আরম্ভ করে গঙ্গানদীর মোহানা পর্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথই ছিল তাদের করতলগত।

কালক্রমে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ দ্রাবিড় জাতি বেলুচিস্তানের পথে বোলান গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উন্নত ধর্ম ও শিল্পে তাদের অধিকার ছিল বটে কিন্তু আদিম অধিবাসীদের চাইতে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল বলেই তারা উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর না হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তদেশ দিয়ে দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল।

এই দুই জাতি যে ভারতীয় সভ্যতার সংগঠনে বহু উপাদান দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের কোনো সাহিত্য বা শিল্পের নির্দিষ্ট নিদর্শনের অভাবেই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে আমরা তাদের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করতে পারি নি। সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় জাতির কীর্তি। এ-কথা কতদূর সত্য তা নির্ণয় করা যায় নি এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ স্থান অধিকার করে তাও স্থির করা সম্ভব হয় নি। শুধু ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এই দুই জাতির কথ্য ভাষার প্রভাব ধরা পড়ে। দাক্ষিণাত্যে যে-চারটি দ্রাবিড় ভাষা আছে তামিল তেলেগু, মালায়লম্ ও কানারী—তাদের মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকলেও তারা তাদের দ্রাবিড় রূপ হারায় নি। পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের নানা উপত্যকায়, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভারতের আদিম অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় এ-সমস্ত জাতির অবদান থাকলেও সে-সভ্যতা যে মূলতঃ আর্য সভ্যতা তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় আর্য জাতি আর্য নামক একটি বিরাট জাতি-গোষ্ঠীর শাখা মাত্র। এই মূল আর্য জাতি প্রথমে কোন্ দেশে বসবাস করত তা আমরা সঠিক জানি না। তবে গ্রীক, লাতিন, ইউরোপের অন্যান্য প্রাচীন ভাষা ইরানী, শক প্রভৃতি ভাষা এই মূল আর্য ভাষা হতে উদ্ভূত বলে মনে হয় যে এ-জাতি বহু প্রাচীন কালেই নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তন্মধ্যে ভারতীয় শাখা খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল।

অবশ্য ভারতবর্ষ এ-যুগে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ বর্তমান কালে যে-দেশকে আমরা আফগানিস্তান বলি তার পূর্বাংশ ছিল ভারতবর্ষের অন্তর্গত। আর্য জাতি ছিল নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত। এই সমস্ত শাখার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, সিন্ধু নদের পশ্চিমে যে-সমস্ত আর্যেরা বাস করতেন তাঁদের নাম ছিল পক্‌থ, ভলান, অলিন, শিব, গন্ধারী ইত্যাদি। এ-সমস্ত নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। পক্‌থেরা খুব সম্ভব বর্তমান যুগের পাঠান, ভলান নাম হতেই বোলান গিরিপথের বর্তমান নামের উদ্ভব। গন্ধারী পেশোয়ার অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

সিন্ধু নদের পূর্বে পঞ্চনদে যে আর্যেরা বসবাস করতেন তাঁদের অনেকের নাম প্রাচীন সাহিত্য হতে পাওয়া যায়, যেমন—ত্রিৎসু, ভরত, পুরু, কুরু, অনু, যদু, তুর্বশ ইত্যাদি। এই আর্যদের শক্তি ছিল অনেক বেশি এবং অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধপ্রণালী ছিল অনেক উন্নত। সেই কারণে তাঁরা অতি সহজেই আদিম অধিবাসীদের হঠিয়ে দিয়ে প্রায় সমস্ত পঞ্জাব করতলগত করতে পেরেছিলেন। এই ভূমিভাগের পশ্চিমাংশ, অর্থাৎ সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী স্থানের আর্যেরা ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হয়ে অন্যান্য আর্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই একটি পরাক্রমশালী জাতিসংঘ গঠন করলেন। এই নূতন জাতির নাম কুরু। এই কুরুদের নাম হতেই সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী স্থানসমূহ কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী ভারতীয় সভ্যতায় যে-প্রভাব বিস্তার করে আসছে তা হতে মনে হয় যে এ-অঞ্চলের আর্যগণ এবং বিশেষতঃ কুরুবংশ এই আর্য সভ্যতার সংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্য হতে আমরা জানতে পারি যে এই কুরুক্ষেত্রই ছিল ধর্মক্ষেত্র, সরস্বতী নদীর তীরে যে-সমস্ত যাগ-যজ্ঞ হত প্রাচীন জগতে তার তুলনা ছিল না, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সদাচারসম্পন্ন এবং সেইজন্যই কুরুক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট অংশের নাম ছিল ব্রহ্মাবর্ত, উপরন্তু কুরুদের কথ্য ভাষা ছিল শিষ্ট ভাষা এবং সে-যুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন।

পূর্বেই বলেছি যে আর্যেরা অনুমান খৃষ্টপূর্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই সময় হতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরে ইতিহাসের যে-যুগ চলেছিল তাকে আমরা বৈদিক যুগ বলতে পারি। এ-যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস অঙ্কন করবার কোনো উপাদান নেই বললেই চলে। তবে এ-যুগের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির যথেষ্ট পরিচয় প্রাচীন সাহিত্য হতে পাওয়া যায়।

এ-যুগের সাহিত্যকে আমরা সাধারণতঃ বৈদিক সাহিত্য বলি। বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ করা হয়—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হলেও বস্তুতঃ সেগুলি একই জাতীয় রচনা। অনেক সময় একই গ্রন্থের নানা অংশ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের প্রধান কার্য ছিল যাগ-যজ্ঞ। এই যাগ-যজ্ঞের জন্য প্রধানতঃ চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল—হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রাহ্মণ। হোতা ছিলেন সর্বপ্রধান, তিনি বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করে পথ প্রদর্শন করতেন ও যজ্ঞের কার্য আরম্ভ করবার আদেশ দিতেন। উদ্‌গাতা সেই মন্ত্রগুলিকে সুর-সংযোগে গান করতেন, অধ্বর্যু মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করতেন এবং ব্রাহ্মণ যজ্ঞকে নানা উৎপাত হতে রক্ষা করতেন।

এই চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের হাতে ক্রমশঃ চতুর্বেদ গড়ে উঠল। হোতার প্রয়োজনের জন্য ঋগ্বেদ, উদ্গাতার জন্য সামবেদ, অধ্বর্যুর জন্য যজুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণের জন্য অথর্ববেদ। কিন্তু বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ-সমাজ একটি অখণ্ড সমাজ ছিল না এবং আর্যগণ ক্রমশঃ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যোগসূত্রও শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা নানা স্থানীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই সম্প্রদায়গুলির নাম ছিল শাখা এবং এই শাখার সংখ্যাও ছিল বহু। প্রত্যেক শাখারই চতুর্বেদ ছিল এবং সে-সমস্ত শাখার চতুর্বেদ মূলতঃ এক হলেও তাদের মধ্যে বৈষম্যও ছিল অনেক।

অনেক শাখাই কালক্রমে তাদের বেদ-সহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি প্রধান শাখার সংহিতা হতেই আমরা সর্বপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় পাই। বর্তমান কালে যে-চতুর্বেদ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা মোটামুটি হচ্ছে শাকল শাখার ঋগ্বেদ সংহিতা, কৌমুদী শাখার সামবেদ, তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী শাখার যজুর্বেদ এবং শৌনক শাখার অথর্ববেদ। এই চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই প্রধান, কারণ অন্য বেদগুলি হয় এর অনুকরণ, না হয় সংকলন।

ঋগ্বেদে এক শত দশটি মন্ত্র আছে। এক-একটি মন্ত্র কতকগুলি ঋক্ বা শ্লোকের সমষ্টি। এই ঋকগুলি ছন্দে রচিত, সেই কারণে বেদের আর-এক নাম ছান্দস। ছন্দ নানা রকমের, ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, জগতী ইত্যাদি। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। এইসব মন্ত্রের রচয়িতাদের ঋষি আখ্যা দেওয়া হত। ঋগ্বেদে আমরা বহু ঋষির নাম পাই, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কান্ব, অত্রি, দীর্ঘতমা ইত্যাদি।

এই সকল ঋষিদের আমরা বর্তমান কালে মন্ত্ররচয়িতা বলি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যাঁদের আস্থা ছিল বা আছে তাঁরা তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা বলেন। মন্ত্র তাঁদের চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত হয়, সেই কারণে তাঁরা ছিলেন দ্রষ্টা মাত্র, কর্তা নয়। সেইজন্য বেদের আর-এক নাম আগম, আগম হচ্ছে সেই সত্যবাণী যা দেবতাদের মুখনিঃসৃত, মানুষের রচনা নয়। সেই কারণেই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে।

সে যা হোক, ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় নি। প্রাচীন হলেও এ-গ্রন্থ কোনো আদিম সভ্যতার নিদর্শন নয়। যে-সব ঋষিরা এ-সব মন্ত্র রচনা করেছিলেন তাঁদের ছন্দ, ভাষা ও ধর্মে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। অনেক মন্ত্রে প্রভূত কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ হতে এ-কথা স্পষ্ট হবে। উষা হচ্ছেন বৈদিক ঋষিদের এক উপাস্য দেবতা। এই উষাকে যে-ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা আজও আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে :

'শুক্লবাস-পরিহিতা যৌবনসম্পন্না দেবদুহিতা উষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্যশালিনী হে সৌভাগ্যবতী উষা, আজ আমাদের উপর তোমার আলোক বর্ষণ কর। আকাশের পথ উদ্ভাসিত করে দেবী অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করেছেন। অরুণাভ অশ্বে আগমন করে দেবী সমস্ত জীবজগৎকে আবার সচেতন করেছেন। তিনি তাদের উপর কত না কৃপা বর্ষণ করেছেন, নিজের উজ্জ্বল আভা হতে কত না কিরণ বর্ষণ করেছেন, কত অসংখ্য প্রভাত চলে গেছে, কিন্তু উষা প্রতিদিনই তাঁর প্রথম সৌন্দর্য নিয়ে

উপস্থিত হয়েছেন। ওগো, তোমরা ওঠ, আমরা পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে পেয়েছি। অন্ধকার বিগত হয়েছে, নূতন আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছে, উষা সূর্যের পথ প্রস্তুত করেছেন, আমরা পুনরায় সেই স্থানে পৌঁছেছি যেখানে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।'

আমরা এ-মন্ত্রকে উষার সৌন্দর্য-বর্ণনা মনে করলেও তা বৈদিক ঋষির মনে অন্য ভাবের উন্মেষ করত। বৈদিক যুগে ঋষিরা দৌস্‌পিতর্‌, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, উষা প্রভৃতি দেবতাকে উপাসনা করতেন। বর্তমান যুগের হিন্দুদের মতো তাঁরা সে-সব দেবতার মূর্তি গড়িয়ে ফুল, ফল, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করতেন না। মন্ত্রপূত করে যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করতেন আর সেই বেদীর নির্দিষ্টস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অগ্নিতে ঘি, সোমরস প্রভৃতি আহুতি দিয়ে দেবতাদের উপস্থিত হবার জন্য আবাহন করতেন। তাঁদের চোখে অগ্নিই ছিল পৃথিবীতে দেবতাদের একমাত্র প্রতিনিধি, সেই কারণে তাঁরা এই অগ্নিকে অবলম্বন করে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতেন। এইরূপে যখন তাঁরা দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতেন তখন পৃথিবীতে যে দৈবী শক্তির আবির্ভাব হ'ত তার দ্বারা যাজক ব্রাহ্মণের, যজমানের এবং সমস্ত জগতের ইষ্ট সাধিত হ'ত। দেবতার সান্নিধ্য লাভ করলে ঋষির মনে যে-ভাবের উদয় হ'ত সেই ভাবাবেশেই বৈদিক মন্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং বৈদিক যুগে ঋষিদের চোখে দেবতারা ছিলেন মানুষের আত্মীয় এবং সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই তাঁদের পৃথিবীতে টেনে আনা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালের হিন্দুদের চোখে সে-সব দেবতা হলেন স্বর্গবাসী, সে-দেবতাদের করুণা ভিক্ষা করা ছাড়া আর তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার সাহস ছিল না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদের উদ্ভব। কিন্তু এই ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে অনেকে এমন একটা পথে গিয়ে উপনীত হলেন যাকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। তাঁদের মতে যজ্ঞ শুধু বহির্যজ্ঞই নয়। অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করে সে-বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা এবং দেবতাদের আহ্বান করাই একমাত্র যজ্ঞ নয়। অন্তর্যজ্ঞও আছে। অর্থাৎ মানুষের অন্তর দিয়েও এমন সাধনা সম্ভব যাতে দেবতাদের সেই সান্নিধ্যই লাভ করা যায়। এই অন্তর্যজ্ঞই হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ।

এই নূতন পথে ঋ । বহুদূর গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে নানা দেবতার মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান পেলেন এবং সেই ঐক্য অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্ম আবিষ্কার করলেন। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবাদই উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ-তত্ত্বের সন্ধান ঋষিরা মন্ত্রের যুগেই পেয়েছিলেন। উপনিষদ্‌ মূলতঃ ব্রহ্মবাদ হলেও তার মধ্যে অন্তর্যজ্ঞ ও বহির্যজ্ঞ এ-দুয়েরই অনেক কথা আছে। উপরন্তু উপনিষদ্‌ ভাব ও ভাষায় এত চিত্তাকর্ষক যে তাকে অনেক স্থলে কাব্য বলা চলে।

উপনিষদ্‌ই বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগ, সেইজন্য তার অন্য নাম বেদান্ত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগ উপনিষদ্‌ হলেও আর-এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বৈদিক যুগের পরবর্তী কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই-জাতীয় রচনাকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছ'টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ।

'শিক্ষা'য় বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ-পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এ-আলোচনা করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ পূর্বেই বলেছি যে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি ও গান করা হ'ত। সেই কারণে শব্দগুলিকে বিশেষ-বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করতে হ'ত এবং সে-

ঝোঁকের হিসাব রাখবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'ত। 'কল্প' নামক বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয় ছিল একাধিক, সে-জন্য এ-বেদাঙ্গের বিশেষ-বিশেষ শাখা ছিল— ধর্মসূত্র, যার দ্বারা সমাজবন্ধন নিয়ন্ত্রিত হ'ত এবং গৃহ্যসূত্র, যার দ্বারা পারিবারিক আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হ'ত, এ ছাড়া শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং সুল্বসূত্রে যজ্ঞের বেদীনির্মাণের হিসাব-নিকাশ। এই সুল্বসূত্র জ্যামিতি-বিশেষ এবং সে-জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতির চাইতে অনুন্নত বিজ্ঞান নয়। তৃতীয় বেদাঙ্গ 'ব্যাকরণ', আর এই ব্যাকরণ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ। বেদের ভাষা ছিল ভারতীয় আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা, আর তা ছিল পরবর্তী সংস্কৃত ভাষা হতে পৃথক। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের অর্থ নির্ধারণ, ছন্দে ছন্দ-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিচার করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ-ছ'টি বেদাঙ্গ বৈদিক যুগের কৃষ্টির বিশ্বকোষ বা Encyclopaedia বিশেষ।

এই সামান্য পরিচয় হতেই বুঝতে পারা যায় যে বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় কৃষ্টির একটি প্রধান যুগ। পরবর্তী কালে ভারতীয় সভ্যতার যা-কিছু নূতন সৃষ্টি তা এই বৈদিক কৃষ্টিকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কোনো যুগেই তাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

বৈদিক যুগের সমাজের রূপ পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে সে-যুগে নানা শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডি অনতিক্রমণীয় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের নাম পাওয়া যায় বটে তবে বেদের মধ্যে সামাজিক যোগসূত্র ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, ব্যবধান ছিল শুধু করণীয় কর্মে। যে-সমস্ত আদিম অধিবাসী আর্যদের আনুগত্য স্বীকার করেছিল বৈদিক সমাজে তারাই ছিল খুবসম্ভব শূদ্র, কিন্তু নীচকর্মরত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যও শূদ্রপদবাচ্য হতেন।

এই আর্য সমাজে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন রাজা হবার উপযুক্ত, কারণ তাঁর প্রধান বিদ্যা ছিল অস্ত্রশস্ত্র চালনা। কিন্তু পরামর্শের জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণের এবং অর্থের জন্য বৈশ্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে হ'ত। বৈদিক যুগে সমস্ত আর্যদেশ এইরূপ কতগুলি রাজবংশের মধ্যে বিভক্ত ছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই আর্যেরা ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার করেন এবং কোশল, বিদেহ ও মগধ অর্থাৎ বর্তমান যুগের বিহার প্রদেশ পর্যন্ত তাঁদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানও তাঁরা হস্তগত করেছিলেন। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, নূতন যুগের প্রারম্ভে, যখন ইতিহাসের পট-পরিবর্তন ঘটল তখন আমরা একটি নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্ধান পেলাম।

সমস্ত উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে নানা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, এ-সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য বা জনপদের মধ্যে কোশল ও মগধ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মগধের রাজবংশের নাম ছিল শৈশুনাগ, কারণ সে-বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিশুনাগ। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, সকলেই এই বংশের রাজা, তাঁরা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজত্ব করেছিলেন। তখন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহে। অজাতশত্রু রাজনৈতিক শক্তি প্রসারের জন্য পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পাটলিপুত্র শোণ এবং গঙ্গার সংগমস্থলে অবস্থিত ছিল বলে রাজগৃহ অপেক্ষা অনেক বেশি সুরক্ষিত ছিল। অজাতশত্রু

ক্রমশঃ নিজের রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করলেন এবং অচিরেই নিকটবর্তী বৈশালী, কোশল প্রভৃতি জনপদ অধিকার করে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের পথপ্রদর্শক হলেন।

শৈশুনাগ বংশের পর নন্দ-রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন এবং এই বংশের প্রধান রাজা মহাপদ্ম নন্দ মগধ রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে হয়তো সমস্ত উত্তরাপথই তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। সে যা হোক, এঁদের পরেই মৌর্যবংশের অভ্যুদয়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে নন্দবংশের সঙ্গে মৌর্যদের সম্পর্ক ছিল এবং মৌর্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তরাপথের এবং দাক্ষিণাত্যেরও অনেকাংশের অধীশ্বর ছিলেন। এ-থেকে মনে হয় যে নন্দবংশীয় রাজারা এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করে রেখে গিয়েছিলেন।

মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই ভারতীয় কৃষ্টি নানা বিভিন্ন ধারার সন্ধান পেয়েছিল। এই সমস্ত ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল যাদের হাতে তারা ঠিক কোশল ও মগধের লোক না হলেও তার নিকটবর্তী বৈশালী এবং কপিলবস্তুর লোক। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন কপিলবস্তু নগরে আর জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন বৈশালীতে। কিন্তু উভয়েই মগধ এবং কোশলেই প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গেই বৈদিক যুগের পরিসমাপ্তি। তার কারণ, এ দুই ধর্ম প্রধানতঃ উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হতে উদ্ভূত হলেও নূতন সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টিতে এমন একটি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যাতে নূতন লোকের প্রবর্তন হতে পারে। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন। উভয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যে ঐক্যও ছিল বহু পরিমাণে। বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করতেন না, উভয়েই সংসারত্যাগী ভিক্ষু ছিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বিভাগ নেই। সেই কারণে বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করতেন না।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সারমর্ম হচ্ছে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পেছনে কোনো আত্যন্তিক সত্য নেই। জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র, কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধও অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথম অংশ গ্রহণ করলেন অর্থাৎ তিনিও স্বীকার করলেন যে জীব ও জগৎ প্রতিভাস মাত্র। কল্পলোকের 'অনিত্য' বা অস্থায়ী রচনা, বুদ্ধের ভাষায় জীব ও জগৎ কতকগুলি সংস্কারের প্রবাহ মাত্র ; জগৎ অনিত্য বলেই দুঃখময়, সেই দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভ করাই হচ্ছে চরম সত্য। সেই চরম সত্য হচ্ছে নির্বাণ।

মহাবীর জগৎকে সত্য বলেই মেনে নিলেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করলেন, কিন্তু সংসারের দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি 'অজীব' বা অব্রহ্ম পদার্থ মনকে কলুষিত করে, সুতরাং তার প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ করাই হচ্ছে তাঁর মতে মানুষের প্রধান কাম্য। কঠিন তপস্যার দ্বারাই এ-কৈবল্য বা কেবল-জ্ঞান লাভ করা যায়।

এই দুই ধর্মকে অবলম্বন করে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম হ'ল ত্রিপিটক, কারণ তা সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক তিনটি ভাগে বিভক্ত। জৈন সাহিত্যে

আদি উপাঙ্গ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। এই উভয় ধর্মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, উপাখ্যান, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই আছে। বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল ছিল। জৈনধর্ম কোনোদিনই বৌদ্ধধর্মের মতো বিপুল আকার ধারণ করে নি, সে-প্রভাবও বিস্তার করতে পারে নি।

পূর্বেই বলেছি যে মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই এই দুই ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই দুই ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময় সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তন ঘটে। বৈদিক যুগ শেষ হবার পূর্বেই বৈদিক ভাষা সাধারণের অবোধ্য হয়ে পড়েছিল, এবং নানা প্রদেশের কথ্য ভাষা প্রসার লাভ করেছিল। মথুরা অঞ্চলে যে কথ্য ভাষা ছিল তা কোশল ও মগধের ভাষা হতে পৃথক ছিল। বুদ্ধ এবং মহাবীর কোশল মগধের ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেন এবং তাঁদের ধর্মকে অবলম্বন করে যে-সাহিত্য রচিত হ'ল তার বাহনও হ'ল সেই কথ্য ভাষা।

বৈদিক ভাষা অবোধ্য হয়ে পড়বার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নূতন ভাষার প্রয়োজন হ'ল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র রচয়িতারা কথ্য ভাষা না নিয়ে যে-সাধুভাষার প্রবর্তন করলেন তার নাম হল সংস্কৃত, আর এই ভাষার সাধুত্ব অটল রাখবার জন্য খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বা তার কিছু পূর্বেই পাণিনী তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করলেন। এই সংস্কৃত সাধুভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ব্যবধান ছিল অনেক, কিন্তু তবুও সে-ভাষা শিষ্টসম্মত বলে পণ্ডিতদের মধ্যে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমস্ত উত্তরাপথে ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থায় এই যুগে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। প্রতি প্রদেশের অধিবাসীদের দৃষ্টি প্রসারতা লাভ করে যেমন একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনায় সহায়তা করছিল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ মানুষের মন প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করে উঠে একটি ভারতীয় মনের সৃষ্টি করছিল।

এই সময়ে আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর শাহ গ্রীস হতে পারস্য পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করে ভারতবর্ষের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হলেন। আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে আফগানিস্তানের অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে পঞ্জাবে উপনীত হন। বিতস্তা নদীর তীরে প্রাচীন পুরুবংশীয় রাজার সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয় তাতে পুরু পরাজিত হন এবং আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। তার পর সিন্ধু-প্রদেশে নানা স্থান জয় করবার পর তিনি পারস্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

আলেকজাণ্ডারের এই আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এ-ঘটনা হতে এ-কথা বোঝা যায় না যে গ্রীকরা ভারতীয় যোদ্ধাদের চাইতে বেশি বীর ছিলেন, কারণ মগধের রাজাদের সামরিক শক্তির গল্প শুনে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা বিপাশা নদী অতিক্রম করে নি। তবে এ-ঘটনা এই কারণে স্মরণীয় যে গ্রীক যোদ্ধারা স্বদেশে ফিরে যাবার পর ভারতীয়েরা ভারতের বাইরে যে বিশাল জগৎ তার সংবাদ পেয়েছিল এবং সে-জগতের সঙ্গে নানা ভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। ভারতবর্ষ জয় করাই যে আলেকজাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞান-গরিমার সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব সময়েই একদল গ্রীক পণ্ডিত থাকতেন বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে যথাসম্ভব উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য।

হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে বাহ্লীক প্রদেশে আলেকজাণ্ডার একটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। এই উপনিবেশ ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং সে-দেশের রাজারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে নি। তারাও যেমন ভারতবর্ষের খবর বাইরে নিয়ে যেত, বাইরের সংবাদও তেমনি ভারতবর্ষে নিয়ে আসত। এই যোগা-যোগের ফলে ভারতীয়দের দৃষ্টি অল্পকালের মধ্যেই প্রসারতা লাভ করে।

॥ দুই ॥

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের দেখা হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের কন্যা হেলেনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধেও কোনো সঠিক খবর নেই। তবে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মগধ-রাজ্য হস্তগত করেন এবং এক বিরাট মৌর্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। বাহ্লীক অঞ্চলের গ্রীকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এমন কোনো বন্দোবস্ত হয়েছিল যাতে তারা আর মৌর্য-সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করে নি। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র অশোকের সময় পর্যন্ত মৌর্য-সাম্রাজ্যের সীমানা অটুট ছিল। অশোক খুবসম্ভব কলিঙ্গ জয় করে সে-সীমানাকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। অশোকের সময় এই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল হিমালয়, পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও আরব সাগর, দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রদেশের পেন্নার নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে খুবসম্ভব ব্রহ্মপুত্র। এ বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করবার জন্য নানা প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশীলা, পশ্চিমে বিদিশা এবং কলিঙ্গদেশে ভুবনেশ্বরের নিকটে তোশলী। এই সমস্ত প্রদেশে রাজপ্রতিনিধি থাকত। পাটলিপুত্র ছিল মৌর্যদের রাজধানী। মৌর্য বাজাদের রাজ্যশাসন-প্রণালী ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সেই শাসন-প্রণালীর যে-পরিচয় আমরা পাই তাতে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। অনুমান খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ দিকে মৌর্য-রাজ্যের অবসান হয়। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌর্য রাজারা এবং বিশেষত অশোক দেশকে এমন একটি উন্নত অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন যা তাঁদের পূর্বে ছিল কল্পনাতীত।

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে-ধর্ম প্রচার করবার জন্য বহু দূর দেশে গ্রীস, মিশর, বাহ্লীক, সিংহল, নেপাল প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরণ করেছিলেন। আর নিজের দেশের মধ্যে নানা শিলালিপিতে দেশবাসীকে ধর্মপথে থাকবার জন্য এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি উদার ভাব পোষণ কববার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করেছিলেন। সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল।

মৌর্যযুগেই আমরা প্রথম ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন পাই, প্রথম নিদর্শন হলেও সেগুলি যে একটি বিশেষ উন্নত শিল্পের নমুনা তাতে সন্দেহ নেই। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নানা স্তূপ নির্মাণ করেন, মধ্যপ্রদেশের সাঞ্চী ও ভরহুত স্তূপ খুবসম্ভব মৌর্যযুগের। এই দুই স্তূপের প্রস্তর-বেষ্টনীতে যে-কারুশিল্পের নিদর্শন রয়েছে তা আজও আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে ও মনে আমোদের সঞ্চার করে। অশোক অনেক স্তম্ভ স্থাপনা করেছিলেন। এই সকল স্তম্ভের উপর শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং স্তম্ভের উপরিভাগে নানা জন্তুর মূর্তি

স্থাপিত হ'ত। এইরূপ কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলির রচনায় শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্যযুগের দু-একটি দেবদেবীর মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায় মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পী অদ্ভুত প্রেরণা পেয়ে এমন একটি অপূর্ব শিল্পের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে-ধারা অবলম্বন করে ভারতীয় শিল্প পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পে পরিণত হয়েছিল।

মৌর্যবংশ পতনের পর হতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিল না। এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল বটে কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট শৃঙ্খলতার অভাব ছিল।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে পাটলিপুত্রে শুঙ্গ ও কণ্ব-বংশ রাজত্ব করেন। শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র সমস্ত উত্তরাপথে হয়তো নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন কিন্তু পরবর্তী রাজারা তা রাখতে পারেন নি। দক্ষিণাপথে অন্ধ্র রাজারা স্বাধীন রাজ্যস্থাপনা করেছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চল রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৈদেশিক জাতি রাজ্যস্থাপনা করেছিল।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজ্যকালেই বাহ্লীক হতে গ্রীকরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অধিকার করে। পঞ্জাবে শাকল নগরে (বর্তমান শিয়ালকোট) তাদের নূতন রাজধানী হয়। শাকলের গ্রীক রাজাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) নামক রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তিনি খুবসম্ভব খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ব্যাপার নিয়েই মিলিন্দ-প্রশ্ন নামক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ বৌদ্ধ-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন-বিশেষ।

এর কিছুকাল পরেই পারসিকেরা পঞ্জাব আক্রমণ করে এবং তক্ষশীলা ও মথুরা অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু তাদের আধিপত্যও ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ মধ্যএশিয়া হতে শকজাতি প্রথমে পঞ্জাবে এবং পরে উজ্জয়িনী অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যভাগে কুষাণ জাতি পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কুষাণ রাজারা ছিলেন বিশেষ পরাক্রমশালী এবং অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করেন। পুরুষপুর (বর্তমান পেশাওয়ার) ছিল তাঁদের রাজধানী। এই বংশের রাজা কনিষ্ক খৃষ্ট্রীয় প্রথম শতকের শেষভাগে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। দক্ষিণে খুবসম্ভব বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই কুষাণ রাজারা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁদের বংশধরেরা কাশ্মীরে খৃষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্তও রাজত্ব করেছিলেন।

এই যুগে রাজনৈতিক শক্তি বৈদেশিক রাজবংশের হস্তগত হলেও ভারতীয় সভ্যতার প্রসারে কোনো অন্তরায় ঘটে নি। গ্রীক শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় ধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। উজ্জয়িনীতে শক রাজারা হিন্দু ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। এই রাজাদের শিলালিপিতেই সর্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্যের পরিচয় পাই। শিলালিপিগুলির ভাষা, ভাব এবং রচনাশৈলী অনেক সংস্কৃত কাব্যের রচনারীতির অনুরূপ। 'মহাভাষ্য'-রচয়িতা পতঞ্জলি এই উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী গোনর্দ নামক স্থানের লোক। উজ্জয়িনীর রাজা

বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবরত্নের উপাখ্যান ঠিক ইতিহাস না হলেও এ-কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে উজ্জয়িনী সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কুষাণ-বংশীয় কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ, পুরুষপুর নগরে তিনি যে বিরাট বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন তার সৌন্দর্য বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী পর্যটককেও আকৃষ্ট করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রধান আচার্য, নাগার্জুন, সংঘরক্ষ, অশ্বঘোষ, সকলেই তাঁর আমন্ত্রণে পুরুষপুরে এসেছিলেন। নাগার্জুন ছিলেন দার্শনিক, মাধ্যমক নামক বৌদ্ধদর্শনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অশ্বঘোষ ছিলেন কবি, তাঁর রচিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলি, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ প্রভৃতি কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে অনেকে অশ্বঘোষকেই উচ্চাসন দিয়েছেন। কনিষ্কের প্ররোচনায় সে-যুগের প্রধান বৌদ্ধ আচার্যগণ পুরুষপুরে সমবেত হয়ে সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাবিভাষা নামক বিরাট টীকা রচনা করেন। সুতরাং কনিষ্ক বৈদেশিক রাজবংশের রাজা হলেও ভারতীয় সভ্যতার উন্নতিকল্পে যে-প্রচেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেশি নেই।

কনিষ্কের সময়ে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ এবং অন্যান্য আচার্যদের হাতে বৌদ্ধধর্মের এক নূতন মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করল। এই নূতন বৌদ্ধধর্মকে বলা হয় মহাযান এবং এর প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকে বলা হয় হীনযান। হীনযানের দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ, হীনযানীরা বুদ্ধ-প্রদর্শিত আচার-ব্যবহার পালন করে ধর্মপথে থেকে পুণ্য অর্জন করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ করবার দুরাশা পোষণ করতেন না। মহাযানে বুদ্ধত্বলাভ করা এবং সমস্ত জগতের মঙ্গলসাধন করাই হচ্ছে প্রধান কাম্য। মহাযানে দুটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আছে—মাধ্যমক ও যোগাচার। মাধ্যমকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাগার্জুন এবং যোগাচারের প্রথম প্রচারক মৈত্রেয়নাথও খুবসম্ভব নাগার্জুনের অল্পকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই দার্শনিক মতে জগৎ মায়ামাত্র। তার পেছনে যে পারমার্থিক সত্য আছে তা নাগার্জুনের মতে শূন্যতা। অঙ্কশাস্ত্রে 'শূন্য' বা zero হচ্ছে সেই বস্তু যার মধ্যে দেনা-পাওনা কিছুই নেই। সুতরাং শূন্যতাও হচ্ছে সেই অবস্থা যার সৃষ্টি, বিনাশ কিছুই নেই। যোগাচার-পন্থীরা এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করলেন এবং সেই শূন্যতা লাভ করবার জন্য উপায় স্থির করলেন। এই উপায় যোগ-সাধনা, সেইজন্য সম্প্রদায়ের নাম যোগাচার।

শাকল নগরে যে-সকল গ্রীকরা গ্রীক-রাজাদের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তাঁরাও ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের বিশেষ দান হচ্ছে শিল্পে। গ্রীকরা শিল্পী ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীক-ভাস্কর্য জগতের একটি প্রধান কীর্তি। এই শিল্পনিপুণ গ্রীকরা যখন ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন তখন গ্রীক-ভাস্কর্যের অনুরূপ একটি ভারতীয় বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের বিশিষ্ট ধারার পত্তন করল। সেই কারণে এ-ধারার নাম ইন্দো-গ্রীক। এই ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্যের রচনা-শৈলী ছিল মূলতঃ গ্রীক আর অনুপ্রেরণা ছিল ভারতীয়। এই শিল্পীরা বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির যে-মূর্তি রচনা করলেন তার রচনা-পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব ছিল, অথচ তার প্রাণ ছিল ভারতীয়। এই ইন্দো-গ্রীক শৈলী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়া, চীন, জাপান পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সে-শিল্প যে প্রাচীন ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান তাতে সন্দেহ নেই।

এই যুগে মথুরা অঞ্চলে শকদের প্রভাবে আর-একটি শিল্পধারার উদ্ভব হয়েছিল যাকে ইন্দো-শক বলা যায়। এই ধারার ভাস্কর্যের মধ্যে শকদের আদিম দেশ মধ্যএশিয়ার প্রভাব ধরা পড়ে। এ-শিল্পধারা ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্যের মতো প্রসার লাভ করে নি।

এই যুগের শিল্পে আর-একটি স্মরণীয় কীর্তির সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণাপথে। মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় অমরাবতী নামক স্থানে এই যুগের এক-বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ-স্থানের প্রাচীন নাম ছিল ধান্যকটক। অন্ধ্র এবং পরে স্থানীয় ইক্ষ্বাকু নামক বংশের রাজাদের সহায়তায় ধান্যকটকের বৌদ্ধসম্প্রদায় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল। সাঞ্চী এবং ভরহুতের স্তূপের অনুরূপ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল, আর চতুর্দিকে সুশোভিত প্রস্তর-বেষ্টনী, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব-মূর্তি প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গ্রীক বা শকদের কোনো প্রভাব নেই, অথচ তা এমন একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পের নিদর্শন যা হতে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ-যুগে শুধু বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই যে ভারতীয় সভ্যতা উৎকর্ষলাভ করেছিল এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। পূর্বেই বলেছি যে এই যুগেই উজ্জয়িনী নগরী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই অঞ্চলেই সে-সংস্কৃতি দুটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে অবলম্বন করে পরিপুষ্টি লাভ করে। এ-দুটি ধর্মমত ছিল শৈব এবং ভাগবত। এই ভাগবত সম্প্রদায় হতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি। গোনর্দের মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ছিলেন শৈব এবং তিনি যোগদর্শন নামক একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতের স্থাপনা করেন। এ-মত শিবভক্তদের হাতেই পরিপুষ্টি লাভ করে। পতঞ্জলি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ এবং শাকলের গ্রীক রাজাদের সমসাময়িক।

এই অঞ্চলে বিদিশা (বর্তমান ভিল্‌সা) নামক স্থানে সেই সময়ের একটি গরুড়স্তম্ভ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি হতে বোঝা যায় যে সে-যুগে ভাগবত মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হেলিয়োদোরস্ নামক এক গ্রীক দূত সে-ধর্ম গ্রহণ করে গরুড়স্তম্ভ স্থাপনা করেন। বিদিশা শুঙ্গ-সাম্রাজ্যের একটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল এবং পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র এই বিদিশাতেই রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। পুষ্যমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করেন এবং সে-যজ্ঞে খুবসম্ভব পতঞ্জলি পৌরোহিত্য করেছিলেন। অগ্নিমিত্রের ইতিহাস অবলম্বনেই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক রচিত হয়।

এই যুগেই ভারতীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান কীর্তি মহাভারত ও রামায়ণ রচিত হয়। এই দুই মহাকাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই দুই গ্রন্থের মধ্যে যে-সমস্ত প্রমাণ আছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়েছিল। নানা প্রাচীন উপাখ্যান এবং খণ্ডকাব্য অবলম্বন করে মহাভারতের প্রধান অংশও এই যুগে রচিত হয়, পরে সে-গ্রন্থ পরিবর্ধিত হয়ে লক্ষ শ্লোকে পরিণত হয়। এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস নয়—কাব্য, এবং সেই কাব্যের অন্তরে ভারতীয় রীতি-নীতি, রুচি, আদর্শ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে-আদর্শ এত উচ্চ যে তা চিরদিন শুধু যে হিন্দুদের মনকেই আলোড়িত করেছে তা নয়, বর্তমান কালে বিদেশের যে-সমস্ত পণ্ডিতেরা সে-গ্রন্থ আলোচনা করেছেন তাঁরাও তার প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি।

এই যুগে নানা দার্শনিক মত, সংখ্যা, বৈশেষিক ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ-সমস্ত দর্শন উপনিষদের ধারা অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের প্রভাবও তার মধ্যে পাওয়া যায়। সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রও এই যুগে রচিত হয়। এ-সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মূল হচ্ছে প্রাচীন কল্পসূত্র। নীতিশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাও এই যুগে।

এ পর্যন্ত যা বলেছি তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগ। এই যুগে রাজশক্তি নানা বৈদেশিক জাতির হাতে থাকা সত্ত্বেও ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পে ভারতীয়েরা যে-সৃষ্টি করেছিলেন তা কোনো যুগেই অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। বৈদেশিক রাজারা সে-সভ্যতার উন্নতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন, কোনো অন্তরায়ের সৃষ্টি করেন নি। ভারতীয় মন ছিল সম্পূর্ণ সজীব, সেই কারণে প্রত্যেকটি ধর্মমত, দার্শনিক মতবাদ এবং শিল্পের ধারাই পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্ত-রাজবংশের অভ্যুদয়। গুপ্ত রাজাদের প্রচেষ্টায় খণ্ড রাজ্যগুলির মধ্যে পুনরায় ঐক্য স্থাপিত হয় এবং সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের উত্তরাংশ নিয়ে আবার একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ পরাক্রমশালী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্ত-রাজবংশের অবনতি আরম্ভ হয় এবং বৈদেশিক হূনদের আক্রমণে পঞ্জাব অঞ্চলে হূন-রাজ্য স্থাপিত হয়। হূনদের রাজধানী ছিল প্রাচীন শাকল নগর। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যও এই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে হর্ষবর্ধন পুনরায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনা করেন বটে, কিন্তু তাও ছিল অল্পকালস্থায়ী।

এ-যুগের সভ্যতা পূর্ববর্তী যুগের ধারা হারায় নি। গুপ্তরাজারা সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সহায়তায় সাহিত্য ও শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মহাকবি কালিদাস ছিলেন খুবসম্ভব চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। গুপ্তরাজাদের শিলালিপিতে সংস্কৃত রচনার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে এ-যুগে সংস্কৃত কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। গুপ্তরাজারা ছিলেন ভাগবত ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁরা বৌদ্ধধর্মেরও পরিপোষক ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় নালন্দার যে-মহাবিহার স্থাপিত হয় তা অল্পকালের মধ্যেই একটি বিরাট শিক্ষায়তনে পরিণত হয়।

খুবসম্ভব গুপ্তরাজাদের দুটি রাজধানী ছিল, পাটলিপুত্র এবং অযোধ্যা। অযোধ্যায় এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁরা দুই ভাই, জন্ম পুরুষপুরে। অসঙ্গ প্রাচীন যোগাচার দর্শনকে পরিবর্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বসুবন্ধু সেই দার্শনিক মতবাদের আরও সূক্ষ্ম বিচার করে বিজ্ঞানবাদ নামক একটি দার্শনিক মতের সৃষ্টি করেন। এই বিজ্ঞানবাদ এমন একটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মত যা বর্তমান যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকদেরও চমৎকৃত করেছে। এ-মতের মূল কথা হচ্ছে যে অলীক জগৎ-সৃষ্টির পেছনে আছে একটি বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র।

গুপ্তযুগে যেমন সাহিত্য কাব্য নাটক প্রভৃতির চরম সৃষ্টি হয়, তেমনি বিজ্ঞান, বিশেষত জ্যোতিষ এবং গণিতশাস্ত্র, বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এ-যুগে বিজ্ঞানের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা,

ছিলেন বরাহমিহির। গুপ্তযুগে শিল্পের প্রাচীন ধারাগুলি তাদের নিজস্ব রূপ হারিয়েছিল বটে কিন্তু তাদের সম্মিলনে এমন একটি প্রবল ধারার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতীয় শিল্পের সর্বপ্রধান গৌরবের বস্তু। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য, চিত্রকলা, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সিংহল, নেপাল, মধ্যএশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। অজন্তা এই যুগের কীর্তি এবং অজন্তার চিত্রাবলীর অনুকরণে রচিত চিত্র আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে পাওয়া গিয়েছে। গুপ্ত-ভাস্কর্যের নিদর্শন অজন্তা, নালন্দা, মথুরা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ভাস্কর্যের এই ধারাই আমরা সামান্য পরিবর্তিত আকারে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ভাস্কর্য মূলতঃ গুপ্ত শিল্পের পরবর্তী নিদর্শন।

গুপ্তযুগের পরও সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক নূতন সৃষ্টি হয়। হর্ষবর্ধন নিজে কবি ছিলেন এবং নাগানন্দ নামক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁরই সময়ে বাণভট্ট তাঁর প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য কাদম্বরী প্রণয়ন করেন। কিন্তু সে-সমস্ত গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য থাকলেও তা গুপ্তযুগের সাহিত্যের তুলনায় অপকৃষ্ট।

হর্ষবর্ধনের পর খণ্ড রাজ্যগুলি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারতীয় সভ্যতা নানা প্রাদেশিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ হতেই ভারতীয় সভ্যতার এই বহুমুখী ভাব প্রকাশ পায় এবং একটি নূতন যুগের সূচনা করে। এর পর রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে অনেকবার ঐক্য সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু নানা প্রাদেশিক কৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ধারাই একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতায় বৈচিত্র্য এনেছিল।

প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য

প্রাচীন শিলালিপি আলোচনা করলে আমরা নানা যুগের সাহিত্যসৃষ্টির ধারা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাই। সে-ইঙ্গিত হতে যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের খোঁজ পাওয়া যায় সে-কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যুহ্লার ও লেভি বিশেষ করে বলেছেন।

সব চেয়ে প্রাচীন শিলালেখ হচ্ছে অশোকের, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। অশোকলিপি ছন্দোবদ্ধ নয়, তার ভাষাও সংস্কৃত নয়। কিন্তু সে-লিপির রচনায় ও শব্দবিন্যাসে একটা সহজরীতির খোঁজ পাওয়া যায়। লঘুত্বই হচ্ছে সে-রচনা-ভঙ্গির প্রাণ এবং সেইজন্যই তাকে সুকুমার সাহিত্যের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না। যখন অশোক বলেন— 'দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা দুবাতসাভিসিতেন মে ইয়ং আনপয়িতে সবতা বিজিতসি মম সুতা লজুকে পাদেসিকে পংচসু পংচসু বসেসু অনুসয়ানং নিখমংতু'— [দেবানাং প্রিয়ো প্রিয়দর্শী রাজা এবমাহ দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন ময়া ইদমাজ্ঞাপিতম্ সর্বত্র বিজিতে মম যুক্তাঃ রজ্জুকাঃ প্রাদেশিকাঃ পঞ্চসু পঞ্চসু বর্ষেষু অনুসংযানং নিষ্ক্রামন্তু], কিংবা যখন বেহিস্তান শিলালিপিতে দরায়ুস অনাড়ম্বরের সঙ্গে বলেন—থাতিয় দারয়বুস্ কৃসায়থিয় [রাজা দরায়ুস বলছেন—] তখন আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে এই দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী ও রাজা দরায়ুস সত্যকার রাজা। অথচ নানা বিশেষণের আড়ম্বর সত্ত্বেও 'পরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী' যে সত্যই সে-মর্যাদার মহারাজাধিরাজ ছিলেন না তা সহজেই বোঝা যায়।

অশোকলিপির রচনানৈপুণ্যের পরিচয় সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও পাওয়া যায়। সুত্তনিপাত বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ—আর এর মধ্যে কখনো-কখনো যে-রচনারীতির খোঁজ পাওয়া যায় তা নিতান্ত মামুলি ধরনের নয়। সে-রীতির সহজগতি ও লঘুত্ব সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদর্ভী রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। সুত্তনিপাতের ধনীয়সুত্তে ধনীয়ো গোপ বুদ্ধকে বলছে—

পক্কোদনো দুদ্ধখীরো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,
ছন্না কুটি, আহিতো গিনি,
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব ॥

[আমি ভাত রেঁধেছি, দুধ দুইয়েছি, মাহি নদীর তীরে আমার বাস, ছাউনির কুটীর, সেখানে আগুন জ্বালা রয়েছে। সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে।]

এর উত্তরে বুদ্ধ বলছেন—

অক্কোধনো বিগতখিলো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো।

বিবটা কুটি নিব্বৃতা গিনি,
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব ॥

[আমি ক্রোধ ও মনের বাধা নষ্ট করেছি। মাহি নদীর তীরে এক রাত্রি আমার বাস, ব্যাবৃত কুটীর, নিবৃত আগুন, সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে।]

বুদ্ধের এ-উত্তর দ্ব্যর্থবোধক হলেও তার সহজগতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। বরং তা বজায় রেখে যে-শব্দালংকারের সৃষ্টি করা হয়েছে তা কোনো সুদক্ষ কবি ব্যতীত অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে সত্যকার সংস্কৃত কাব্যের ছায়া ধরা পরে। এ-যুগের দু'খানি শিলালিপির রচনাভঙ্গি কাব্যরীতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গির্ণার লিপি ও মহারাজ শ্রীপুলমায়ির নাসিক লিপি। গির্ণার লিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগের, তার রচনা গদ্য ও ভাষা সংস্কৃত। নাসিক লিপিও ওই শতকের মধ্যভাগের, তার রচনারীতি গদ্য ও ভাষা প্রাকৃত, আর সে-প্রাকৃত হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।

গির্ণার লিপি যিনি রচনা করেছিলেন তিনি কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাব্যের প্রাণ হচ্ছে ওজোগুণ, আর এ-গুণ নির্ভর করে সমাসবহুলতার উপর। এ দুই লিপিই হচ্ছে সমাসবহুল। গির্ণার লিপিতে শব্দ ও বর্ণের অনুপ্রাসেরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আর এ-সব অনুপ্রাস না থাকলে কাব্যরচনা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। শব্দানুপ্রাস—গুরুভিরভ্যস্তাম্নো রুদ্রদাম্নো, সৃষ্ট-বৃষ্টিনা,—বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং,—ন্যায়াদ্যানাং বিদ্যানাং ইত্যাদি। বর্ণানুপ্রাস—গিরিশিখরতরুতটাট্টালকোপতল্পদ্বারশরণোচ্ছ্রয়-বিধ্বংসিনা।

গির্ণার লিপিতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার বিরল হলেও আছে, যেমন—পর্ব্বত-প্রতিস্পর্দ্ধী, মরুধন্বকল্প, পর্জ্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাঃ কৃতায়াং।

এইসব গুণ থাকাতেই গির্ণার লিপিকে গদ্যকাব্য বলা চলে, আর এ-লিপির রচয়িতাও এ-রচনা যে কাব্য তা নিজেই বলেছেন। কারণ মহারাজা রুদ্রদামনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—স্ফুট-লঘু মধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারালঙ্কৃত-গদ্যপদ্য-[কাব্যবিধান-প্রবীণে] ন—

সুতরাং এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবির মতেও কাব্য দুই প্রকারের, গদ্য ও পদ্য। সে-কাব্যের গুণ হচ্ছে স্ফুটত্ব, লঘুত্ব, মাধুর্য, বৈচিত্র্য, কান্তি, শব্দবিন্যাস, ঔদার্য ও অলংকার। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেও কাব্যের বিশেষতঃ বৈদর্ভীরীতির এইসব গুণের কথা বলা হয়েছে—

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধির্মাধুর্য্যমোজঃ
পদসৌকুমার্য্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ
কাব্যস্য গুণা দশৈতে ॥ (নাট্যশাস্ত্র)

শ্রীপুলমায়ির নাসিক লিপিতেও এ-সব গুণ আছে, সেইজন্য সে-লিপিও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ-লিপি সমাসবহুল, সুতরাং ওজোগুণবিশিষ্ট, এ-লিপিতে নানা অলংকার ও অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে, তা ছাড়া ভাষায় মাধুর্যের অভাব

নেই। রাজাকে নানা পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—হিমবত-মেরু-মদর-পবত-সম-সারস (হিমবতমেরুমন্দারপর্বতসমসারস্য—)। রাজা নানা রত্নের অধিপতি হিসাবেই হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের তুল্য। এ-উপমা আমরা কালিদাসের কাব্যেও পাই—

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নাপানিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ (রঘুবংশ)

কাদম্বরীতেও রাজা শূদ্রককে বলা হয়েছে—

মেরুরিব সকলভুবনোপজীব্যমানপদচ্ছায়ঃ—

শ্রীপুলমায়িকে আরও যে-সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তা সংস্কৃত কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত কোনো কবি ব্যতীত অন্য লেখকের কল্পনার বহির্ভূত। তাঁকে বলা হয়েছে—সবরাজলোকমডলপতিঘাতসাসন, দিবসকরবিবোধিতকমলবিমলসদিশবদন, তিসমুদতোয়-পীতবাহন, পটিপুণচদমডলসসিরীকপিয়দশন, বরবারণবিকমচারুবিকম—, ভুজগপতি-ভোগপীনবটবিপুলদীঘসুদ…ভুজ, অভয়োদকদানকিলিননিভয়কর, অবিপনমাতুসুসাসক, পোরজননিবিসেসসমসুখদুখ—, খতিয়দপমানমদন—ইত্যাদি।

শিলালিপিতে ছন্দোবদ্ধ কাব্যের প্রথম পরিচয় পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও কুমারগুপ্তের রাজ্যকালীন বন্ধুবর্মনের মান্দাসোর প্রশস্তিতে। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের ও মান্দাসোর পঞ্চম শতকের। মান্দাসোরের প্রাচীন নাম হচ্ছে দশপুর, পশ্চিম মালবের রাজধানী, শিবানী নদীর তীরে অবস্থিত। এ-নদী হচ্ছে তাপ্তীর শাখা-বিশেষ। দশপুরের প্রশস্তিকার বৎসভট্টি যে উজ্জয়িনীর কাব্যকলানিপুণ কবিদের, এমন কি কালিদাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা খুবই সম্ভব।

মান্দাসোর প্রশস্তিতে মহাকাব্যের যে-সব গুণ নির্দিষ্ট হয়েছে তা সবই আছে। তাতে দেশ নগর, সমুদ্র পর্বত, ঋতু রাজা প্রভৃতির বর্ণনা পাই। তাতে ছন্দের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। মোট চুয়াল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে অনুষ্টুভ, আর্যা, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিতা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, বংশস্থ, বসন্ততিলকা, শার্দূলবিক্রীড়িত, হারিণী প্রভৃতি নানা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

কবি বৎসভট্টি মঙ্গলাচরণের পর দেশের বর্ণনা করেছেন। সে-দেশ হচ্ছে লাট দেশ, সে-দেশ কবির মতে পৃথিবীর মধ্যে রমণীয়, কারণ সে-দেশের গাছপালা কুসুমভরে অবনত, সে-দেশের পর্বতমালা শ্যামল বনানীদ্বারা আবৃত, আর সে-দেশ মন্দির, সভাগৃহ ও বিহারে পূর্ণ।

কুসুমভরাবনততরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ।
লাটবিষয়ান্নগাবৃতশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পাঃ ॥

এই লাট দেশ হতে একদল প্রসিদ্ধ শিল্পী দশপুর নগরে এল। দশপুর নগর ক্রমে পৃথিবীর তিলকস্বরূপ হয়ে উঠল। সে-নগরের সরোবর কারণ্ডবসংকুল, প্রফুল্ল পদ্মে সমাকীর্ণ, আর তার তটদেশস্থ বৃক্ষসমূহ হতে পতিত পুষ্পরাশি জল পর্যন্ত তীরদেশকে বিচিত্রিত করেছে। এই সরোবরে যে-সব হংস ক্রীড়া করে তারা বিলোল তরঙ্গের আঘাতে পতিত পদ্মের রেণু দ্বারা আবৃত, সরোবরের কোথাও বা মৃণাল কেশরপূর্ণ পদ্মের ভারে অবনত। বনরাজি নিজপুষ্পভারে নত বৃক্ষে পূর্ণ, আর প্রগল্‌ভ অলিকুল ও অজস্র গীত-

নিপুণ পুরাঙ্গনাদের সংগীতে মুখর সে-নগরের গৃহসমূহ উন্নতদেহা ও শুক্লবর্ণা নারী ও চঞ্চল পতাকায় শোভিত হয়ে তড়িল্লতাবৃত শ্বেতবর্ণ মেঘশৃঙ্গের ন্যায় দেখায়, সে-নগরের অট্টালিকা গন্ধর্বদের সংগীতে মুখর কৈলাস-পর্বতের তুঙ্গ শিখরের ন্যায় দেখায়; আর সে-সব অট্টালিকা, বেদিকা, চঞ্চল কদলীবন ও নানা চিত্রকর্মের দ্বারা শোভিত। উন্নতবক্ষা প্রীতি ও রতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামদেবের ন্যায় সে-নগর দুটি চঞ্চল স্রোতস্বতীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ।"

এই বর্ণনায় বৎসভট্টি সমসাময়িক কবিদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন মনে হয়। বিশেষত নগরের গৃহ ও অট্টালিকা ও পুরবাসিনীদের বর্ণনায় মেঘদূতের ছায়া ধরা পড়ে। বৎসভট্টি বলেছেন—

চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থশুক্লান্যধিকোন্নতানি।
তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূটতুল্যোপমানি গৃহাণি যত্র॥
কৈলাসতুঙ্গশিখরপ্রতিমানি চান্যান্যাভান্তি দীর্ঘবলভীনি সবেদিকানি।
গন্ধর্ব্বমুখরাণি নিবিষ্ট চিত্রকর্ম্মাণি লোলকদলীবনশোভিতানি॥

আর মেঘদূতে—

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদস্তাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

দেশের ও নগরের বর্ণনার পর বৎসভট্টি রাজবর্ণনা করতেও ভোলেন নি। প্রথমে হচ্ছে গুপ্তবংশীয় মহারাজা কুমারগুপ্তের বর্ণনা—কারণ মান্দাসোর-লিপি উৎকীর্ণ হয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে। মহারাজা কুমারগুপ্ত হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর (ভারতের) অধিপতি, সে-পৃথিবীর মেখলা চতুঃসমুদ্রের তটদেশ, সুমেরু ও কৈলাস তার পয়োধর, আর তার হাসি হচ্ছে বনান্তের প্রস্ফুটিত কুসুম—

চতুস্সমুদ্রান্তবিলোলমেখলাম্ সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীম্ কুমারগুপ্তে পৃথিবীম্ প্রশাসতি॥

সেই সময়ে দশপুরের রাজা ছিলেন বিশ্ববর্মনের পুত্র রাজা বন্ধুবর্মন। বিশ্ববর্মন নিজে দীনের প্রতি অনুকম্পাপরবশ, আর্ত ও বিপন্নের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, অনাথের নাথ, বন্ধুবর্গের প্রতি দানে কল্পদ্রুম, ভয়ার্তের অভয়দায়ক, সমস্ত রাজ্যের বন্ধু, আর তা ছাড়া—

দীনানুকম্পনপরঃ কৃপণার্ত্তবর্গসন্ধাপ্রদোঽধিকদয়ালুরনাথনাথঃ।
কল্পদ্রুমঃ প্রণয়ীনামভয়ংপ্রদশ্চ ভীতস্য যো জনপদস্য চ বন্ধুরাসীৎ॥

আর তাঁর পুত্র বন্ধুবর্মন ছিলেন স্থির, রাজনীতিকুশল, বন্ধুপ্রিয়, প্রজামণ্ডলের বন্ধু, বন্ধুবর্গের ভয়হর্তা, দৃপ্ত, শত্রুপক্ষের সংহারে দক্ষ। তিনি সুপুরুষ, যৌবনসম্পন্ন, রণপটু, বিনয়নম্র এবং রাজা হয়েও রিপুর বশবর্তী ছিলেন না।…

স্থৈর্য্যনয়োপপন্নো বন্ধুপ্রিয়ো বন্ধুরিব প্রজানাং।
বংধ্বার্ত্তিহর্ত্তা নৃপবন্ধুবর্ম্মা দ্বিডদৃপ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষঃ॥
কান্তো যুবা রণপটু বিনয়ান্বিতশ্চ রাজাপি সন্ন-পাশ্রিতোন মদৈঃ স্মরাদ্যৈঃ।

শৃঙ্গারমূর্তিরভিভাত্যনলঙ্কৃতোঽপি রূপেণ যঃ কুসুমচাপ ইব দ্বিতীয়ঃ ॥
বৈধব্যতীব্রব্যসনক্ষতানাং স্মৃত্বা যমদ্যাপ্যরিসুন্দরীণাম্।
ভয়াদ্ভবত্যায়তলোচনানাং ঘনস্তনায়াসকরঃ প্রকম্পঃ ॥

এ বন্ধুবর্মনের রাজত্বকালে দশপুর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে ও সে-নগরের শিল্পীরা নিজেদের একটি শ্রেণী স্থাপন করে এবং সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে কবি বৎসভট্টি ঋতুবর্ণনার অবকাশ পেয়েছেন, আর সে-বর্ণনায় তিনি বিশেষভাবে রচনানৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় যে-ঋতুতে সে হচ্ছে হেমন্ত—

রামাসনাথরচনে দরভাস্করাংশুবহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে ॥
রোধ্রপ্রিয়ংগুতরুকুন্দলতা-বিকাশপুষ্পাসবপ্রমুদিতালি কলাভিরামে।
তুষারকণকর্কশশীতাবাতবেগপ্রনৃত্তলবলীনগনৈকশাখে ॥
স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনাবিপুলকান্তপীনোরু।
স্তনমজঘনঘনালিঙ্গন নির্ভৎসিততুহিনহিমপাতে ॥

তখন নারীরা তাঁদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হন, সূর্যকিরণের খরতাপে উপত্যকাসমূহ আনন্দদায়ক হয় ও মীন গভীর জলে প্রবেশ করে। তখন চন্দ্রকিরণ, হর্ম্যতল, চন্দন, তালবৃন্ত কিংবা হার কিছুই উপভোগ করা যায় না, পদ্ম শিশিরসিক্ত হয়ে তার গন্ধ হারায়। তখন রোধ্র, প্রিয়ঙ্গুতরু, কুন্দলতা প্রভৃতির বিকশিত পুষ্পের মধুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর সুমধুর কলধ্বনি করে। তখন শীতবায়ু শিশিরকণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্কশ হয়ে ওঠে আর সে-বায়ুর দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে লবলীকুঞ্জ ও নগনবৃক্ষের বিরল শাখা নৃত্য করে।

হেমন্তের এই বর্ণনা কালিদাসের ঋতুসংহারে অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্ ॥

এই হেমন্ত ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত দশপুরের সূর্যমন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তার সংস্কার প্রয়োজন হয়। সে-সংস্কার হয় শীত ঋতুতে। সুতরাং এই অবসরে কবি বৎসভট্টি শীত ঋতুর বর্ণনা করেছেন—

স্পষ্টৈরাশোকতরুকেতকসিন্দুবারলোলাতিমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাং।
পুষ্পোদগমৈরভিনবৈরাধিগম্য নূনমৈক্যং বিজৃম্ভিতশরে হরপূতদেহে ॥
মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগীত-নগনৈকপৃথুশাখে।
কালে নবকুসুমোদ্গমদন্তুরকান্তপ্রচুররোধ্রে ॥

অর্থাৎ সে (শিশির)-ঋতুতে যে-দেবতার দেহ হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই কামদেব অশোক, কেতকী, সিন্দুবার, চঞ্চল অতিমুক্তকলতা ও মদয়ন্তিকার অভিনব পুষ্পোদগমের সঙ্গে তাঁর (পঞ্চ) শর ফিরিয়ে পান। তখন নগনবৃক্ষের বিরল পৃথুল শাখা মধুপানে মত্ত মধুকরকুলের সংগীতে মুখর হয়, আর প্রচুর পল্লবে মনোহর রোধ্র নবকুসুমোদগমে সজ্জিত হয়ে দোদুল হয়ে ওঠে।

এলাহাবাদ প্রশস্তি বৎসভট্টির প্রশস্তির মতো দীর্ঘ না হলেও তার রচয়িতা বৎসভট্টির চেয়ে বেশি কাব্যকলাকুশল ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল আর তার রচয়িতা হরিষেণ সে-প্রশস্তিকে নিজেই কাব্য বলেছেন (এতচ্চ কাব্যমেব—)। এ-প্রশস্তিতে যে-রাজার গুণ-কীর্তন করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত। প্রশস্তির প্রথম অংশ ছন্দোবদ্ধ আর দ্বিতীয় অংশ গদ্য—সে-গদ্যও কাব্যগন্ধী। প্রথম অংশে হরিষেণ যে-সব ছন্দ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে—স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত ও মন্দাক্রান্তা। প্রশস্তির এ-অংশ খণ্ডিত, মাত্র একটি শ্লোক সম্পূর্ণ পাওয়া যায়—

আর্য্যো হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকীর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেষুচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি ॥

সমুদ্রগুপ্তের পিতা তাঁকে 'তুমি সত্যই আর্য' এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, 'তুমি এইবার পৃথিবী শাসন কর।' তাঁর নয়ন তখন স্নেহে ব্যালুলিত, আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন; সভাসদেরা তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর স্বজনবর্গের আনন ম্লান।

হরিষেণের এই শ্লোকটি নিখুঁত, এর ছন্দ ও শব্দবিন্যাস নির্দোষ—একার্থবোধক শব্দের পুনরুক্তি নেই আর এর বিষয়বস্তু কবি অতি অল্পকথায় স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই বৃদ্ধ মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করছেন, স্নেহার্দ্র হলেও তাঁর নয়ন তত্ত্বদর্শী, ভবিষ্যতে পুত্রদের মধ্যে কে সম্রাটপদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে তাঁর সূক্ষ্মদর্শী নয়ন তা বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রগুপ্তকে যখন তিনি 'তুমি সত্যই আর্য' বলে বরণ করছেন তখন সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাসদেরা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠেছে আর অন্য কুমারগণের আনন তখন ব্যর্থতার আক্ষেপে ম্লান।

হরিষেণের এই প্রশস্তির আর-একটি খণ্ডিত শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যা ও কাব্যের মর্যাদা জানতেন। তিনি বিদ্বানের সঙ্গে কালযাপনে আনন্দলাভ করতেন (প্রজ্ঞানুষঙ্গোচিতসুখমনসঃ); শাস্ত্রতত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ)। সুতরাং তাঁর আজ্ঞা পণ্ডিতমণ্ডলীর গুণের দ্বারা যেন বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে সৎকাব্য ও লক্ষ্মীর মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ তা দূরীভূত করেছিল। সেইজন্যই তাঁর রাজ্যকীর্তি বিদ্বল্লোকে বহু কবিতায় কীর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

—সৎকাব্যশ্রীবিরোধান্ বুধগুণিতগুণাজ্ঞনাহতানেব
বিদ্বল্লোকে বি...স্ফুটবহুকবিতাকীর্ত্তিরাজ্যংভুনক্তি।

কাব্যকলা ও শ্রীর এই বিরোধের কথা অন্য কবিরাও বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন, আর তাদের উভয়ের মিলনের কথা কালিদাসও বলেছেন—

পরস্পরবিরোধিন্যোরেক সংশ্রয়দুর্লভম্।
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েস্তু সদা সতাম্ ॥

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উজ্জয়িনীতে শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আর শকরাজারা বিজাতীয়

হলেও ভারতীয় সভ্যতায় অল্পায়াসেই দীক্ষালাভ করেন। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক আর বিদ্বান্ ও কবিদের সত্যকার বন্ধু। এর কারণ হয়তো ব্যক্তিগত, কারণ যদি প্রশস্তিকারের কথা মানতে হয় তাহলে বলতে হবে যে মহারাজা রুদ্রদামন ছিলেন নিজে কাব্যকলায় নিপুণ। উজ্জয়িনীর এই 'কাব্যবিধানপ্রবীণ' রাজা ও তাঁর অনুবর্তী অন্যান্য রাজাদের পরিপোষকতায় উজ্জয়িনী ও তার নিকটবর্তী দশপুর প্রভৃতি স্থানে বহুদিন ধরে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা চলে, আর সে-চেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গির্ণার, নাসিক ও দশপুরের প্রশস্তিতে।

উজ্জয়িনীর কবিদের সাহিত্যসৃষ্টির এই চেষ্টার হয়তো একটা পূর্বেকার ইতিহাস আছে। সুত্তনিপাতের ধনিয়সুত্তের নিপুণ কবি বুদ্ধকে ও সেই সঙ্গে আমাদের নিয়ে যান মাহী নদীর তীরে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক—আর তিনি উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী গোনর্দে বসে যে-মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যেই আমরা প্রথম সংস্কৃত কাব্যছন্দের প্রয়োগ পাই (যেমন—মালতী, বসন্ততিলকা ইত্যাদি)। উজ্জয়িনী থেকে বিদিশা পর্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ, গোনর্দ সেই পথের উপর অবস্থিত। আর সেই বিদিশাই হচ্ছে আবার কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের পটভূমি।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তরাজারা নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আর তাঁদের নূতন রাজধানী পাটলিপুত্রে আবার আমরা নূতন কবিদের সাক্ষাৎ পাই। হরিষেণের প্রশস্তিতে আমরা কাব্যরচনার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাই, গুপ্তবংশের পরবর্তী কালের প্রশস্তিতেও কাব্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্তী কালের প্রশস্তির রচনারীতিতে আমরা বেশির ভাগ পাই অনুকরণ, বাগাড়ম্বর ও চাটুবাদ।

সুতরাং সংস্কৃত শিলালিপির রচনারীতি থেকে বিচার করলে মানতেই হবে যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত কাব্যসৃষ্টির প্রধান যুগ, আর সে-কাব্যসৃষ্টি সুরু হয় প্রথম পশ্চিম ভারতে অবন্তীদেশে—উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করে।

এ-প্রদেশ কেন কাব্যরচনায় প্রথম কেন্দ্র হয়েছিল তার হয়তো কোনো গূঢ় কারণ থাকতে পারে। বনরাজিতে শোভিত, অনুচ্চ পর্বতসংকুল ও নদীমাতৃক এই দেশ হয়তো কবিকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করতে পারত—সেইজন্যই তাঁদের রচনা আমাদের মনকে মাহী, নর্মদা, রেবা প্রভৃতি নদীর তীরে টেনে নিয়ে যায়। আর সেইজন্যই হয়তো কাব্যপ্রকাশের রচয়িতা ও তাঁর সঙ্গে বাংলার ভাবপ্রবণ সাধক চৈতন্যদেব রেবা নদীর তীরবর্তী বেতসীতরুতলে আর চৈত্র মাসের রজনীতে বিকশিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ-মন্দ সমীরণ না হলে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা।
স্তেচোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপিতত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান

ভারতীয় সভ্যতায় বৌদ্ধধর্মের অবদানের সঠিক মূল্য এখনো নির্ধারিত হয় নি। তার প্রধান কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হতে বিলুপ্তপ্রায়। নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগের কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অধুনা যে-বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রয়েছে তার ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটির প্রচেষ্টায় যে কয়টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তার কাজও যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হয় নি। অপর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, চীন ও জাপানে প্রচলিত রয়েছে বলেই সে-ধর্মকে আমরা সাধারণতঃ বৈদেশিক ধর্ম মনে করে থাকি।

আমাদের আধুনিক ধর্মজীবনে বৌদ্ধধর্মের স্থান নেই বটে, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার স্থান যে অতি উচ্চে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অশোকের সময় হতে আরম্ভ করে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত যদি ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগ ধরা যায়, তবে সে-যুগকে বৌদ্ধযুগ বললে কোনো অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা তা প্রধানতঃ এই যুগের মধ্যেই নিবদ্ধ। আর সেই সৃষ্টিতে যে-বৌদ্ধধর্ম একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর স্বদেশে ও বিদেশে মৈত্রীর মন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশে তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের হাতেই সে-সব দেশে বৌদ্ধধর্মের বীজ উপ্ত হয়েছিল। শক যবন পহ্লব প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল, তখন ভারতীয় সাংস্কৃতিক গণ্ডি তার প্রাকৃতিক সীমা হতে ক্রমশঃ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই একদিকে সমগ্র মধ্যএশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ এবং অন্যদিকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ এক বিরাট সভ্যতার গণ্ডির মধ্যে স্থান পেল। এই সভ্যতাই হচ্ছে বৌদ্ধসভ্যতা।

বৌদ্ধধর্ম কেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। বৌদ্ধধর্ম বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। এ-ধর্ম ছিল মূলতঃ গৃহত্যাগী ভিক্ষুর ধর্ম, আর সে-ভিক্ষুর চোখে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। পরোপকার ও সেবাই হচ্ছে ভিক্ষুর প্রধান ধর্ম, অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পেও যখন তিনি আত্মোৎসর্গ করেন তখন তিনি হন কল্যাণমিত্র। বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুর আদর্শকে এক সার্বজনীন পটভূমিকার উপর স্থাপিত করেছিল বলেই তা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের আরও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। অলৌকিকে বিশ্বাসের উপর এ-ধর্ম

অবস্থিত নয়। কর্মবাদ হচ্ছে তার প্রধান ভিত্তি। কৃতকর্মের ফলেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটছে। এই কর্মফলেই যেমন তার অধোগতি হয়, সেই কর্মের প্রভাবেই তার উর্ধ্বগতি বা বুদ্ধত্ব লাভ হতে পারে। সুতরাং বুদ্ধত্বলাভও তার আয়ত্তের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষই তার সাধনার দ্বারা এই চরম অবস্থা লাভ করতে পারে। এই ধর্ম বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক মানুষকেই অভিভূত করতে পারে। ফলে ঘটেছিলও তাই। অতি অল্পকালের মধ্যেই বহু বৈদেশিক জাতি এ-ধর্মকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করেছিল।

এই কারণে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সার্বজনীন সংস্কৃতি বললে কিছু ভুল হয় না। তার মধ্যে এই আন্তর্জাতিকত্ব ছিল বলেই তা বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করতে পেরেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৌদ্ধ ধারাকেই **International** বলা চলে। ভারতীয় প্রতিভা সর্বজাতিকে দেবার উপযোগী করে যে-সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল তা ছিল এই বৌদ্ধ সংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি বলা চলে। জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার ও ধর্ম নিয়েই এ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারণে যখনই বৌদ্ধধর্ম বিদেশীর ভারতপ্রবেশ সুগম করেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম নানাভাবে তার জন্য বাধা সৃষ্টি করেছে এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে। সে-চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই, তবে তা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান অবদান হচ্ছে যে তা এশিয়ার নানা জাতির সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনা করেছে। তুর্কী, চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে আমাদের কোনো জাতিগত বা ভাষাগত সম্পর্ক নেই। কিন্তু বহুকাল ধরে তারা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলন করেছে বলে তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমাদের মনোভাবের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপরন্তু নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ওইসব জাতি এখনো ভারতবর্ষকে তাদের **Holy Land** মনে করে। ভারতবর্ষ হতেই যে তাদের শিক্ষা ও ধর্মের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, এ-কথা তারা ভোলে নি। সেই কারণে ভারতবাসীকে যে তারা নিকটআত্মীয় বিবেচনা করে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান অবদান হচ্ছে শিল্প। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতে প্রথম শিল্পের উন্মেষ হয়। মৌর্যযুগে এ-শিল্প মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণে। এই যুগের দু-একটি যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তিতেও অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য-যুগের শেষভাগে এবং তৎপরবর্তী শুঙ্গ যুগেই একটি উন্নত শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধস্তূপের চতুর্দিক সুসজ্জিত করবার প্রয়োজনেই এই শিল্পের সৃষ্টি। সাঞ্চী ও ভরহুত স্তূপেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা পাওয়া গিয়েছে। খোদিত চিত্রবহুল প্রস্তরনির্মিত রেলিং, সুসজ্জিত দ্বারস্তম্ভ প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় যে এই শিল্প খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল।

পরবর্তী যুগের শিল্পও বৌদ্ধশিল্প। তিনটি বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পের উদ্ভব ও পরিণতি ঘটেছিল—গন্ধার বা উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ, মথুরা ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় ধান্যকটক বা অমরাবতী। গন্ধার প্রদেশের শিল্পে গ্রীক-প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে, সেই

কারণে গন্ধার শিল্পকে কেউ-কেউ ইন্দ্রোগ্রীক শিল্পও বলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত গ্রীক এবং পরে কুষাণদের হাতে এই শিল্পের উন্নতিসাধন হয়। এই যুগেই বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তিকল্পনা হয় সম্ভবতঃ বিদেশীদের হাতে। মথুরা অঞ্চলে এই যুগের যে-বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয় না। দক্ষিণে অমরাবতীও একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই আর-একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শিল্পের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের জন্যই একে একটি নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়। এই বিভিন্ন বৌদ্ধশিল্প-সম্প্রদায়ের হাতেই ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি ঘটে। এইসব সম্প্রদায়ের উদ্ভব না হলে গুপ্তযুগের চরম শিল্পোন্নতি সম্ভব হ'ত না। পরবর্তী কালের শিল্পের মধ্যে বৌদ্ধশিল্প একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। সে-আলোচনা না করলেও এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টি ও পরিণতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করলেও একই কথা বলা চলে। বৌদ্ধ গুহামন্দিরেই তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতীয় সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্মের একটি বিরাট অবদান স্বীকার করতে হয়। ধর্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, উপদেশগ্রন্থ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ গাথা-সাহিত্যে এমন বহু রচনা আছে যা এখনও সাহিত্যরসিককে আনন্দ দিতে পারে। পালি ভাষায় রচিত 'ধর্মপদ' ও 'সুত্ত নিপাত' এই-জাতীয় গ্রন্থ। এ-সব গ্রন্থের গাথায় সরলতা, সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগ, ছন্দের সহজগতি প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায়। অথচ এগুলি অতি প্রাচীন কালের রচনা, কতকাংশ মৌর্যযুগের—এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। পালি ভাষায় রচিত 'মিলিন্দপঞহো' অতি প্রাচীন রচনা। এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা। এ-গ্রন্থও বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও অনেক অমূল্য সম্পদ রয়েছে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অশ্বঘোষ যে একজন মহাকবি ছিলেন তা সকলেই স্বীকার করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যকার মহাকবিদের রচনা যে বেশি আছে তা বলা যায় না এবং অশ্বঘোষকে বাদ দিলে সে-রচনার সংখ্যা আরও কমে যায়। অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের, সুতরাং কালিদাসের পূর্বগামী। কালিদাস যে তাঁর অনুবর্তন করেছেন সে-কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। অশ্বঘোষের রচিত একখানি নাটকের খণ্ডিতাংশ মধ্যএশিয়ার মরুভূমি হতে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের নাটকের ইতিহাসে এ-নাটক যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার কারণ অশ্বঘোষের কাল নির্ণয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। নানা কাব্যগ্রন্থ ও গাথা-সংগ্রহ ছাড়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে আর-এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে, সে-রচনা হচ্ছে 'অবদান'। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দিব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'অবদানকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। আর এইসব সংগ্রহের মধ্যে এমন অনেক অবদান আছে যার রচনা ও গল্পাংশ এখনো আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। এইসব রচনা একসময়ে যে শিল্পীকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের খোদিত বা অঙ্কিত চিত্র থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

অতএব ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের অবদান অতি মূল্যবান। ভারতবর্ষের বাইরেও নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম শিল্প ও সাহিত্যে প্রেরণা দিয়েছিল। মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করবার পূর্বে কোনো সাহিত্য বা শিল্প ছিল না। এমন কি কোনো লিপিও ছিল না। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পর সে-সব দেশের অধিবাসীরা ভারতীয় লিপির প্রয়োগ আরম্ভ করল এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হতে নানা গ্রন্থ নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করল। এই অনূদিত গ্রন্থই হল তাদের প্রথম সাহিত্য এবং এইসব অনুবাদই তাদের পরে সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ওইসব দেশের প্রথম শিল্প-নিদর্শনও ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে গণ্য হতে পারে। ভারতীয় বৌদ্ধগুহা-মন্দিরের ন্যায় গুহা-মন্দির, প্রাচীর-চিত্র, গন্ধার শিল্পের অনুকরণে রচিত বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি হচ্ছে মধ্যএশিয়ার বৌদ্ধশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। তিব্বতের প্রথম শিল্পের নমুনাও মগধ ও বঙ্গদেশের পালযুগের শিল্পের অনুকরণ। অনেক সময় বঙ্গ ও মগধ হতে শিল্পীরা গিয়েই তিব্বতের নানাস্থানে বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধমূর্তি রচনায় সহায়তা করেছিলেন। অতএব ভারতের বাইরে নানা অনুন্নত দেশের সাহিত্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধধর্ম যে প্রেরণা জাগিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই প্রেরণার মূলে ছিল ভক্তিবাদ। বৌদ্ধধর্মই যে প্রথম ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে এ-কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈদিক ধর্মের মূল কথা ভক্তি নয়। ক্রিয়া-কাণ্ডের মূলে যাজ্ঞিক ক্রিয়ার অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস। সেই ক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত দৈব ও প্রাকৃতিক শক্তিকে আত্মহিতে নিয়োগ করবার ক্ষমতা। উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উপর। এই দুই চিন্তার ধারার মধ্যে ভক্তিবাদের বিশেষ কোনো স্থান নেই। বেদ-পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মই প্রথম ধর্ম যা ক্রমশঃ ভক্তিবাদের গোড়া পত্তন করে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তা ঘটে নি। কারণ বুদ্ধদেব স্বয়ং ছিলেন জ্ঞানবাদী। তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধশাস্ত্রের সত্যানুসরণ করতেই বলেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তারা বুদ্ধদেবের পূজাতেই আত্মনিয়োগ করেছিল। তার কারণ বৌদ্ধধর্মে দেব-দেবীর কোনো স্থান নেই, বুদ্ধদেবই ছিলেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপী দেবতা। সেইজন্য তিনিই হয়েছিলেন তাদের ভক্তিভাজন। স্তূপের মধ্যে সমাহিত বুদ্ধদেবের নশ্বরদেহের 'শরীর' বা অস্থিকে পূজা করা, স্তূপকে প্রদক্ষিণ করা, পুষ্পচন্দনে সে-স্তূপের পূজা করা—এ-সমস্ত প্রথাই বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছিল।

এই ভক্তিবাদ মৌর্যযুগের পূর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পর বুদ্ধধর্মাবলম্বীর উপাসনার জন্য দেশময় স্তূপ নির্মাণের আয়োজন করেন। তিনি নিজে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বুদ্ধদেবের উপর এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই ব্যাকুলতাই হয়েছিল শিল্প ও সাহিত্য রচনার উৎস-বিশেষ। ভক্তিবাদের এই প্রথম ধারা প্রবাহিত হবার পরই তা বহুমুখী হতে আরম্ভ করে। এর অতি অল্পদিনের মধ্যে শৈব, ভাগবত প্রভৃতি নূতন-নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যা এই ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই নূতন পরিণতির ফলে বৈদিক ধর্মের প্রকৃত পরিসমাপ্তি

ঘটে, পরবর্তী কালে তার প্রচলন থাকলেও তার সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এইসব ভক্তিমূলক নূতন সম্প্রদায়ের হাতেই বৌদ্ধশিল্প ও সাহিত্যের অনুরূপ শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং ভারতে নূতন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব এ-কথা স্বীকার করতে হয় যে-বৌদ্ধধর্মই ভারতের এই অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এই সংস্কৃতিকেই আমরা 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলে থাকি।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা

মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যা কোনো জাতিকে যুগ-যুগান্তর ধরে বিভিন্নমুখী অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে। সাহিত্যিক, শিল্পী, সাধক সকলেই তা থেকে তাঁদের মনের খোরাক আহরণ করতে পারেন। সেই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য; আর-এক তৃতীয় মহাকাব্য ছিল গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' যা বিস্মৃতির অন্তঃস্থলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে-কাব্য আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও লাকোৎ নামক একজন ফরাসী অধ্যাপক তার সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন (**Lacote : Essai sur Guṇāḍhya et la Bṛhatkatha**) তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৃহৎকথা পুনরুদ্ধারের আশা এখন আর দুরাশা নয়। বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর'। কথাসরিৎসাগর বৃহৎকথার আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও যে সেই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছিল তাতে এখন আর কারো সন্দেহ নেই। সোমদেব তাঁর কাব্য রচনা করেন খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষপাদে। আর তার অল্পকাল পূর্বেই একাদশ শতকের মধ্যভাগে ওই বৃহৎকথা অবলম্বন করেই ক্ষেমেন্দ্র রচনা করেন তাঁর 'বৃহৎকথামঞ্জরী'। ক্ষেমেন্দ্রের পূর্বেও গুণাঢ্যের বৃহৎকথা অবলম্বনে আর-একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল— বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ'। বুধস্বামীর সঠিক তারিখ জানবার উপায় না থাকলেও অনুমান করা যায় তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া বৃহৎকথার বিভিন্ন গল্প নানা নাটক ও কাব্যগ্রন্থের আধার হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প ছিল তার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়। সংস্কৃত ছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় বৃহৎকথার গল্পাংশ প্রচলিত ছিল। তামিল ভাষায় বৃহৎকথার গল্পাংশের অনুবাদ করা হয়েছিল। পারস্য ভাষাতেও যে বৃহৎকথার অনুবাদ প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় কাশ্মীরী ঐতিহাসিক শ্রীবরের তৃতীয় রাজতরঙ্গিণীতে। এই অনুবাদ এখন পাওয়া যায় না, তবে তার একখানি খণ্ডিত পত্রের সন্ধান মেলে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পুঁথিশালায়।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নয়। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন—

কথাপি সর্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।
ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাং ॥

'কথা রচনা যেমন সংস্কৃতে হয় অন্যান্য সমস্ত ভাষাতেও হয়। অদ্ভুতার্থ বৃহৎকথা ভূতভাষায় লেখা হয়েছিল।' বাণভট্ট কাদম্বরীতে উজ্জয়িনীর লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তারা মহাভারত, পুরাণ, রামায়ণ ও বৃহৎকথার প্রগাঢ় ভক্ত ছিল। হর্ষচরিতের ভূমিকাতেও তিনি বৃহৎকথাকে একখানি অপূর্ব কাব্য বলে স্বীকার

করেছেন—

সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরীপ্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ॥

এ ছাড়া নানা পরবর্তী গ্রন্থ, দশরূপ, তিলকমঞ্জরী, নলচম্পূ প্রভৃতিতে বৃহৎকথা এবং গুণাঢ্যের উল্লেখ আছে। গুণাঢ্য ব্যাস ও বাল্মীকির সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। কোনো-কোনো কবি তাঁকে ব্যাসের অবতার বলেও সম্মানিত করেছেন।

গুণাঢ্যের খ্যাতি বৃহত্তর ভারতেও পৌঁছেছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকে কম্বুজের রাজা যশোবর্মন তাঁর এক শিলালেখে গুণাঢ্যের উল্লেখ করেছেন—

পারদঃ স্থিরকল্যাণো গুণাঢ্যঃ প্রাকৃতপ্রিয়ঃ।
অনীতির্থো বিশালাক্ষঃ শূরো ন্যক্কৃতভীমকঃ ॥

একই শিলালেখের অন্যত্র বলা হয়েছে—

গুণান্বিতস্তিষ্ঠতু দূষিতোঽপি
স্থানার্পিতো যেন পুনর্গুণাঢ্যঃ।
গদ্যোঽপালণ্ডাবুবিভূষণায়
হরপ্রযুক্তঃ কিমুতামৃতাংশুঃ ॥

এই সকল উল্লেখ থেকে এ-কথা অনুমান করা অসংগত নয় যে পৈশাচী-প্রাকৃতে রচিত বৃহৎকথা বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একাদশ শতকে কাশ্মীরে যে পৈশাচী বৃহৎকথা দেখেছিলেন সে-গ্রন্থ গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কি তার সংস্করণ-বিশেষ তা নিঃসন্দেহে স্থির করা সম্ভব নয়; কিন্তু সোমদেব যে এই প্রাচীন কাশ্মীরী বৃহৎকথার সংস্কৃতানুবাদ করেছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বৃহৎকথায়াঃ সারস্য সংগ্রহম্ রচয়াম্যহম্। 'আমি বৃহৎকথার সারসংগ্রহ রচনা করব।' তিনি অন্যত্র বলেছেন—

নানা কথামৃতময়স্য বৃহৎকথায়াঃ।
সারস্য সজ্জনমনোম্বুধিপূর্ণচন্দ্রঃ।
সোমেন বিপ্রবরভূরিগুণাভিরাম-
রামাত্মজেন্ বিহিত খলু সংগ্রহোঽয়ম্ ॥

অম্বুধিপূর্ণচন্দ্রের উল্লেখে গ্রন্থের নামের ইঙ্গিত রয়েছে। অম্বুধিপূর্ণচন্দ্র-সাগরসার। সোমদেব এই সাগরসারের সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে কাশ্মীরী বৃহৎকথার সম্পূর্ণ নাম ছিল 'বৃহৎকথাসরিৎসাগর' আর সোমদেবের গ্রন্থের নাম ছিল 'বৃহৎকথাসরিৎ-সাগরসারসংগ্রহ'—সংক্ষেপে 'কথাসরিৎসাগর'। কাব্যাদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এ-কথা জানা ছিল, কেননা গুণাঢ্যের বৃহৎকথার উল্লেখে তিনি বলেছেন—

পৈশাচ্যাশ্চপেভ্রংশরূপত্বাদপভ্রংশকাব্যং
বৃহৎকথেতি জ্ঞেয়ম্ যথা বৃহৎকথাসরিৎসাগরঃ।
বৃহৎকথাসরিৎসাগরসারস্তু সংস্কৃতেন তস্যানুবাদরূপঃ।

সুতরাং তাঁর মতে পৈশাচী ও অপভ্রংশ ভাষা একই ভাষা। বৃহৎকথা অপভ্রংশ কাব্য, আর তার অন্য নাম বৃহৎকথাসরিৎসাগর। এই গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদই হচ্ছে বৃহৎকথাসরিৎ-

সাগরসার।

কথাসরিৎসাগর যে বৃহৎকথার অনুবাদ তা সোমদেব নিজেও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।
গ্রন্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদ্যতে॥

অর্থাৎ, মূল ও এই গ্রন্থ একই রকম। মূল থেকে এতটুকু ব্যতিক্রমও নেই। স্থানে-স্থানে সংক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র। প্রভেদ শুধু ভাষার।

ঔচিত্যান্বয়রক্ষা চ যথাশক্তি বিধীয়তে।
কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা॥

অর্থাৎ, মূল কাব্যের ঔচিত্য ও ঘটনাপারম্পর্য যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। কথারস অব্যাহত রেখে কাব্যাংশগুলির অনুযোজনা করা হয়েছে।

সুতরাং সোমদেবের এ-কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কথাসরিৎসাগর মূল বৃহৎকথার অনুগামী। সে-গ্রন্থে যে শুধু মূলের গল্পাংশই রয়েছে তা নয়, মূল গ্রন্থের কাব্যরস ও ঔচিত্যগুণও অব্যাহত রাখা হয়েছে। মূল বৃহৎকথার শুধু ভাষাই রূপান্তরিত হয়েছে আর কোনো-কোনো স্থানে কথাবস্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

যে-উদ্দেশ্যে সোমদেব এ-কাজে হাত দিয়েছিলেন তা অতি মহৎ। মহাকবির খ্যাতি অর্জন করবার জন্য তিনি তা করেন নি। বৃহৎকথার কথাজাল সহজে স্মরণ রাখবার সহায়তা হতে পারে মনে করেই তিনি এই কাব্য রচনা করেন—

বৈদগ্ধ্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ।
কিংতু নানা কথাজালস্মৃতিসৌকর্যসিদ্ধয়ে॥

বৃহৎকথার মূলগ্রন্থ যদি কোনোদিন উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে সোমদেবের এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

॥ দুই ॥

গুণাঢ্যের এই কাব্যরচনার ইতিহাস পাওয়া যায় উপাখ্যানে, আর সে-উপাখ্যান খুবসম্ভব তাঁরই স্বকপোলকল্পিত। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব উভয়েই ওই উপাখ্যান পেয়েছিলেন প্রাচীন বৃহৎকথা হতে। কাব্যে অপ্রাকৃত রস অবতারণার জন্যই এই অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি। পার্বতী একসময়ে পুরাণ, ধর্মকথা প্রভৃতি শুনে-শুনে বিরক্ত হয়ে শিবের কাছে জেদ ধরলেন নূতন ধরনের গল্প শোনবার। শিব পার্বতীকে বিদ্যাধরদের গল্প বললেন আর সেই গল্প লুকিয়ে শুনলেন পুষ্পদন্ত। পুষ্পদন্ত স্ত্রী জয়াকে সে-গল্প বললেন এবং জয়া ভুলক্রমে সেই কথা শোনালেন পার্বতীকে। পার্বতী ক্রোধে অভিভূত হয়ে পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দিলেন যে সে যেন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। গণ মাল্যবান্ পুষ্পদন্তকে রক্ষা করতে এসে নিজেও হলেন বিপদগ্রস্ত। পার্বতী তাঁকেও ওই একই অভিশাপ দিলেন। শুধু এইটুকু ভরসা দিলেন যে পুষ্পদন্ত বিন্ধ্যপর্বতে কাণভূতি-নামক পিশাচকে যখন এই গল্প শোনাতে পারবে, তখন সে শাপমুক্ত হবে। কুবেরের অভিশাপে সুপ্রতীক-নামক এক যক্ষ ওই পিশাচ হয়ে জন্মাবে। মাল্যবান্ শাপমুক্ত হবে যখন সে কাণভূতির নিকট ওই গল্প শুনতে পাবে। ফলে পুষ্পদন্ত জন্মগ্রহণ করলেন কৌশাম্বীতে, তাঁর নাম হল বররুচি বা কাত্যায়ন; আর

মাল্যবান্ জন্মগ্রহণ করলেন প্রতিষ্ঠানপুরে, তাঁর নাম হল গুণাঢ্য। বররুচি নন্দরাজার মন্ত্রী হলেন। স্বপ্নে তিনি আগেকার জন্মের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে কাণভূতির সন্ধান পেলেন আর তাঁকে বিদ্যাধরদের সাত রাজার গল্প শুনিয়ে শাপমুক্ত হলেন।

ওদিকে গুণাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে নানা বিদ্যা অধিগত করলেন। রাজা সাতবাহন তাঁর গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করলেন। সাতবাহন রাজা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানতেন না। রানী একদিন জলক্রীড়ার সময় বললেন, 'জল ছিটিয়ো না' (মোদকং দেহি)। রাজা বুঝলেন 'মোদক দাও'। রানী বেশ একটু হাসলেন। রাজা লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে মনস্থ করলেন। গুণাঢ্য বললেন ব্যাকরণ শিখতে ছ'বছর লাগবে। মন্ত্রী শর্ববর্মন বললেন ছ'মাস লাগবে। গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করলেন যে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কোনো ভাষাই ব্যবহার করবেন না, এককথায় বোবা হয়ে থাকবেন। শর্ববর্মন 'কাতন্ত্র' রচনা করে ছ'মাসে রাজাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিয়ে দিলেন। গুণাঢ্যের হার হ'ল ; তিনি প্রতিজ্ঞা-মতো কথা বন্ধ করে বিন্ধ্যপর্বতে চলে গেলেন।

বিন্ধ্যপর্বতে পিশাচদের বাস। গুণাঢ্য তাদের থেকে পৈশাচী ভাষা শিখে নিলেন। এই সময়ে তাঁর দেখা হ'ল পিশাচী কাণভূতির সঙ্গে। কাণভূতি তাঁকে শোনালেন পুষ্পদন্ত বা বররুচির থেকে শেখা বিদ্যাধরদের অপূর্ব গল্প। গুণাঢ্য নিজের রক্ত দিয়ে সাত লক্ষ শ্লোকে এই অদ্ভুত গল্প ছন্দোবদ্ধ করলেন ও তাঁর দুই শিষ্যের হাতে এই কাব্যগ্রন্থ পাঠালেন সাতবাহন রাজার নিকট। কিন্তু পিশাচদের ভাষায় রচিত এ-কাব্যগ্রন্থ রাজা গ্রহণ করলেন না। গুণাঢ্য মনের দুঃখে তাঁর এই কাব্য পুড়িয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। তারপর এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে বনের পশুপক্ষীদের কাছে তাঁর কাব্যের এক-এক পাতা পড়ে শোনাতে লাগলেন আর তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পশুপক্ষীরা পরস্পরে হিংসা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে এই কাব্য শুনতে লাগল। এই অদ্ভুত ব্যাপার রাজার শ্রুতিগোচর হল। তিনি বনে এলেন গুণাঢ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি তাঁর মহাকাব্যের শেষ অংশ রক্ষা করলেন। তখন সমগ্র কাব্যের মাত্র সপ্তমাংশ অবশিষ্ট ছিল। এই শেষাংশই হচ্ছে নরবাহনদত্তের গল্প, আমাদের বৃহৎকথা।

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। গুণাঢ্য জন্মেছিলেন প্রতিষ্ঠানে আর সাতবাহন রাজাদের সময়। প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল গোদাবরীর তীরে, অন্ধ্র-রাজাদের রাজধানী। অন্ধ্র-রাজাদের বংশগত নাম ছিল সাতবাহন বা শালিবাহন। কোন্ সাতবাহনের সময় গুণাঢ্য জন্মেছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই বংশের রাজা হাল প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যের আদর করতেন এবং নিজে সপ্তশতী নামে প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন। সাতবাহন-বংশের এই রাজা খুবসম্ভব খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হয়তো তাঁর দ্বারাই প্রচারিত হয়েছিল। পুষ্পদন্ত বা বররুচির সঙ্গে গুণাঢ্যের সম্পর্ক কল্পিত বলেই মনে হয়। বররুচি প্রথম প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন ; তাঁর গ্রন্থের নাম প্রাকৃতপ্রকাশ। বৃহৎ-কথার ভাষা পৈশাচীও ছিল প্রাকৃত ভাষা, সেই কারণেই গুণাঢ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। 'কাতন্ত্র' ব্যাকরণের রচয়িতা শর্ববর্মনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনিও খুবসম্ভব রাজা

হালের সময়েই জীবিত ছিলেন। 'কাতন্ত্র' ও 'ইন্দ্রব্যাকরণ' একই সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ। কাতন্ত্রের খণ্ডিত অংশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের পুঁথিতে মধ্যএশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে।

উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল খুবসম্ভব কাশ্মীরে, যখন শৈব ধর্মের বিশেষ প্রচলন হয়। পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থই শিব ও পার্বতীর মধ্যে গুহ্য আলাপ-আলোচনারূপে বর্ণিত হয়েছে। পার্বতী প্রশ্ন করেন, শিব তার উত্তর দেন। এ-সব আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির শোনবার অধিকার নেই। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা এইরূপ লুকিয়ে শোনবার আরও দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। হয়তো পৈশাচী ভাষায় রচিত বৃহৎকথার মর্যাদা বাড়াবার জন্যই গুণাঢ্য তা শিব-মুখনিঃসৃত কাব্যরূপে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সূত্র অবলম্বন করে পরে উপাখ্যান রচিত হয়। আর সে-উপাখ্যান হয়তো খুব প্রাচীন নয়। সুবন্ধুর বাসবদত্তার টীকাকার জগদ্ধর লিখেছেন—

গুণাঢ্যঃ তেন কিল ভগবতো ভবানীপতের্মুখকমলাদুপশ্রুত্য
বৃহৎকথা নিবদ্ধেতি বার্তা।

এতে বিদ্যাধরদের উপাখ্যানের কোনো ইঙ্গিত নেই। শিব যখন পার্বতীকে গল্প বলছিলেন গুণাঢ্য তা লুকিয়ে শোনেন আর বৃহৎকথা কাব্য রচনা করেন।

॥ তিন ॥

যে-ভাষায় বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল তার নাম পৈশাচী, পিশাচদের ভাষা। গুণাঢ্যের সময়ে সে-ভাষা সাহিত্যের বাহন হয় নি বলেই তাঁর কাব্য তাঁর জীবদ্দশায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করতে পারে নি। পৈশাচী ছিল মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতির মতোই একটি প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সে-প্রাকৃত কোন্ অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল তা জানা যায় নি। পৈশাচী ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় নি বলেই তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র, ত্রিবিক্রম, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র প্রভৃতি পৈশাচীর উল্লেখ করেছেন। এঁরা পৈশাচী প্রাকৃতের অন্তর্গত নানা উপভাষার নাম করেছেন, যেমন—চুলিকা-পৈশাচী, কৈকেয়-পৈশাচী, বাহ্লীক-পৈশাচী, গান্ধার-পৈশাচী ইত্যাদি। এইসব বৈয়াকরণিকদের মধ্যে যাঁরা অর্বাচীন তাঁরা পাণ্ড্য, নেপাল, কুন্তল প্রভৃতি অন্যান্য দেশের পৈশাচী উপভাষারও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা পৈশাচীর প্রকৃত রূপ না জানাতে। বস্তুতঃ চুলিকা-পৈশাচী এবং কৈকেয়, বাহ্লীক ও গান্ধার প্রদেশের পৈশাচীই পৈশাচী-প্রাকৃতের সত্যকার উপভাষা ছিল।

চুলিক ও শূলিক নাম অভিন্ন। পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নানা দেশ ও জাতির নামের মধ্যে ওই দুই নাম অভিন্ন ভাবেই পাওয়া যায়। এই অভিন্নত্বের উদাহরণস্বরূপ চালুক্য-শোলঙ্কির উল্লেখ করা যেতে পারে। চালুক্যদের একটি শাখাই শোলঙ্কি নামে পরিচিত ছিল। চালুক্য ও শোলঙ্কি উভয়ে একই নামের বিভিন্ন রূপ। শূলিক নামে যে-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সে-জাতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। সমরকন্দ অঞ্চলে যে-ইরানী জাতি বাস করত তাদের নাম ছিল সুগ্ধ বা সুগ্-দিক্, আর এই সুগ্-দিক্ নামই কালক্রমে সুলিক্ বা শূলিক্ রূপ গ্রহণ করে। মধ্যএশিয়ায় সুগ্ধজাতি শূলিক্ নামেই পরিচিত ছিল। তিব্বতী সাহিত্যেও তারা ওই নামেই উল্লিখিত হয়েছে। শূলিকরা ছিল বণিক্ এবং বাণিজ্য-

ব্যপদেশে তারা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে পঞ্জাব অঞ্চলেও তাদের ছোটোখাটো উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শক ও কুষাণদের সঙ্গেই তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা তাদের মুখে যে-রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাকেই খুবসম্ভব শূলিক-পৈশাচী বা চূলিক-পৈশাচী বলা হ'ত। কৈকেয়, গান্ধার, বাহ্লীক প্রভৃতি দেশও ছিল ওই অঞ্চলে অবস্থিত। অতএব ওই অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাই ছিল মুখ্যতঃ পৈশাচী।

পৈশাচীকে ভূতভাষাও বলা হয়েছে। সে-ভাষা যদি মুখ্যতঃ উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের কথ্য ভাষাই হয় তাহলে পিশাচ বা ভূত নামের সার্থকতা কি ? খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে আরম্ভ করে প্রায় তিন-চার শতাব্দী ধরে মধ্যএশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে বসবাস করতে থাকে। এদের আচার-ব্যবহারে যে শিষ্টাচার ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, উপরন্তু তাদের কোনো সাহিত্যও ছিল না। সুতরাং এইসব বিদেশী জাতিকে পিশাচ বা ভূত বলে উল্লেখ করা কিছু বিচিত্র নয়।

পৈশাচী প্রাকৃতের কোনো-কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হেমচন্দ্র করেছেন। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণের স্থানে পৈশাচীতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যথা—

গ, ঘ=ক,খ	**জ, ঝ=চ, ছ**
গিরিতটম্=কিরিতটম্	জীমূতঃ=চীমূতো
নগরম্=নকরম্	রাজা=রাচা
ঘর্ম=খম্মো	ঝর্ঝরঃ=চচ্ছরো
মেঘঃ=মেখো	নির্ঝর=নিচ্ছরো।
ড, ঢ=ট, ঠ	**ব, ভ=প, ফ**
ডমরুকঃ=টমরুকো	বালকঃ=পালকো
তড়াগম্=তটাকম্	রভসঃ=রফসো
ঢক্কা=ঠক্কা	ভগবতী=ফকবতী
গাঢ়ম্=কাঠম্	চিম্বম্=টিম্পম্ ইত্যাদি।

এই সকল বৈশিষ্ট্য উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের কথ্য ভাষায় পাওয়া যায়। শাহ্‌বাজগড়ীতে অশোকের যে-খরোষ্ঠী লেখ পাওয়া গিয়েছে তার ভাষায় এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সে-ভাষাতেও 'গ' স্থানে 'ক', 'জ' স্থানে 'চ', 'ব' স্থানে 'প' প্রভৃতি পাওয়া যায়। উদাহরণে এ-কথা স্পষ্ট হবে। গ্রীক রাজা মেগাস ও এন্তিগোনসের নাম 'মক' ও 'অংতিকিন' রূপে, 'কম্বোজ' 'কম্বোচ' রূপে, 'বাঢ়ম্' 'পঢ়ম' রূপে পাওয়া যায়। ওই অঞ্চলের এখনকার কথ্য ভাষা, যাকে গ্রীয়ার্সন Dardic বা 'দরদ' আখ্যা দিয়েছেন বাস্‌গলি, পাশাই, কাশ্মীরী প্রভৃতিতেও ওইসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এইসব কারণেই গ্রীয়ার্সনসাহেব মনে করেন যে পৈশাচী ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা। এমন কি তিনি মনে করেন যে প্রাচীন নাম 'পৈশাচী' ও বর্তমান 'পাশাই' অভিন্ন। মধ্যএশিয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভাষার প্রচলন হয়েছিল। খোটান ও তার নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রাচীন যুগের যে-সব সরকারি নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তার ভাষাও হচ্ছে এই প্রাকৃত। এই

ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদের একখানি খণ্ডিত পুঁথিও খোটান অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে এই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল তা মনে করা অসংগত নয়। কাশ্মীরী এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে বৃহৎকথা মুখ্যতঃ প্রচলিত ছিল কাশ্মীরে। খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সে-কাব্যগ্রন্থ কাশ্মীরে সংরক্ষিত ছিল। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব উভয়েই সে-গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যরচনায় তার প্রভূত ব্যবহার করেছিলেন।

বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগরের মধ্যে একই নামের বিভিন্ন রূপ (যথা, দীপকর্ণ, দ্বীপিকর্ণি ; বেদগর্ভ, বেদকুম্ভ) থেকে অনুমান করা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদের পৈশাচী নামেরই সংস্কৃত অনুবাদ করতে গিয়ে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। হেমচন্দ্র পৈশাচীর উদাহরণ দিতে গিয়ে পৈশাচী গ্রন্থ-বিশেষ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এ-সব শ্লোক যে কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া তা তাঁদের রচনাভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়।—

পুধুমতংসনে সব্বস্স যোব সম্মানম্ কীরতে—

প্রথম দর্শনে সর্বস্যৈব সম্মানম্ ক্রিয়তে।

এতিসম্ অতিট্ঠপুরবম্ মহাধনম্ তথূনা—

ঈদৃশম্ অদৃষ্টপূর্বম্ মহাধনম্ দৃষ্ট্বা।

পনমথ পনয়পকুপ্পিতগোলীচলনগ্গলগ্গপটিবিম্বম।
তস্সু নখতপ্পনেসুম্ একাতস্তনুথলম্ লুদ্দম্ ॥
নচ্চংতস্স য লীলাপাতুক্খেবেন কংপিতা বসুথা।
উচ্ছলংতি সমুদ্দা সৈলা নিপতন্তি তং হলং নমথ ॥—

প্রণমত প্রণয়প্রকোপিতগৌরীচরণাগ্রলগ্নপ্রতিবিম্বম্।
দশসু নখদর্পণেষু একাদশতনুস্থলম্ রুদ্রম্ ॥
নৃত্যতশ্চ লীলাপাদোৎক্ষেপেণ কম্পিতা বসুধা।
উচ্ছলন্তি সমুদ্রাঃ শৈলা নিপতন্তি তং হরং নমত ॥

অনুরূপ ঘটনা-পরম্পরা কথাসরিৎসাগরে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে উক্ত পৈশাচী শ্লোকগুলি মূল বৃহৎকথার। হেমচন্দ্র সে-গ্রন্থ হয় নিজে দেখেছিলেন, না-হয় শ্লোকগুলি অন্য গ্রন্থ থেকে পেয়েছিলেন।

মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা

ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রারম্ভ ঠিক কোন্ সময়ে সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের দিকেই সে-যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতগুলির বহিরঙ্গ বা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভেদ চলে যায় এবং সে-গুলির মধ্যে সাধন-বিষয়ে এমন একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা সম্ভবত ভারতীয় চিন্তার ধারায় মধ্যযুগের সূচনা করে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকদের হাতে যে-সাধনপন্থা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল তার প্রারম্ভ এইখানে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের তুলনামূলক বিচার করবার নানা চেষ্টা হয়েছে। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের দিকে রচিত বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্যাপদের আলোচনা করলে সে-সাহিত্যের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বৌদ্ধধর্মের এই শেষ যুগের গ্রন্থসমূহে এক বহিরাচারশূন্য সাধন-পদ্ধতির খোঁজ পাওয়া যায়। এই সাধন-ব্যাপারে দেব-দেবীর পূজা নেই, তীর্থভ্রমণের প্রয়োজন নেই। মন্ত্রজপ, দেব-দেবীর আবাহন প্রভৃতি কিছুই নেই। এই ধর্মমতে শাস্ত্রপাঠেরও কোনো আবশ্যকতা নেই। গুরু-শিষ্যের কোনো জাতিবিচার করা হয় না। একপ্রকার যোগই হচ্ছে এই সাধন-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ, সেখানে সাধকের দেহই হচ্ছে প্রধান বস্তু, বিশ্বের যা-কিছু সমস্তই দেহের মধ্যে, সুতরাং বহিরঙ্গের কোনো ক্রিয়ার বিশেষ মূল্য নেই, মূল্য আছে শুধু অধ্যাত্ম-সাধনার। সে-সাধনপদ্ধতিও হওয়া চাই যতদূর সম্ভব সহজ।

জৈনধর্মে এরূপ কোনো সাধন-পদ্ধতির খোঁজ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই ধর্মের দুই প্রধান সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদের নানা শাখা আছে। দুই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে সত্য কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহিরঙ্গের ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত প্রবল। এই দুই সম্প্রদায়ের যে-সব শাস্ত্র-গ্রন্থ এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্তরঙ্গের সাধন-পদ্ধতির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোনো ভারতীয় ধর্মমতে গূঢ় সাধন-পদ্ধতির উল্লেখ না থাকাই আশ্চর্য।

কিছুদিন পূর্বে 'পাহুড়দোহা' নামক একখানি দিগম্বর জৈন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন অমরাবতী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হীরালাল জৈন। 'পাহুড়দোহা'র রচয়িতা মুনি রামসিংহ প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন—এ থেকে অনুমান করা যায় যে মুনি রামসিংহ একাদশ শতকে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

'পাহুড়দোহা' অপভ্রংশ ভাষায় লেখা, অপভ্রংশ হচ্ছে প্রাকৃত ভাষার পরবর্তী রূপ এবং প্রাদেশিক ভাষাসমূহের পূর্বগামী। সেই কারণে এই অপভ্রংশ ছিল নানা রকমের,

সৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী ইত্যাদি। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে এই ভাষা নানা প্রদেশে সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, অনেক জৈন গ্রন্থও এই ভাষায় রচিত হয়। জৈন গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা ছিল গুজরাট ও রাজপুতানা অঞ্চলের প্রচলিত অপভ্রংশ।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে অনুরূপ ভাষায় যে-সব বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সে-সব গ্রন্থের রচয়িতারা ছিলেন সিদ্ধাচার্য, এঁদের মধ্যে সরহ, কাহ্নু ও তিল্লোপাদের রচিত নানা দোহা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত দোহার সঙ্গে জৈন পাহুড়দোহাকে ভাব ও ভাষার দিক থেকে তুলনা করা চলে। এই তুলনা হতে বেশ বোঝা যায় যে এই যুগে সমস্ত উত্তর-ভারতে এমন একটি সাধনপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল যা জৈন বৌদ্ধ সকলকেই একতাসূত্রে আবদ্ধ করে ফেলেছিল।

পাহুড়দোহায় ভেদজ্ঞানের কোনো মূল্য দেওয়া হয় নি ; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কিংবা শ্রেষ্ঠ, অধম, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায় জন্মায়।

ইউঁ বরু বংভণু ণ বি বইসু ণউ খত্তিউ ণ বি সেসু।
পুরিসু ণউঁসউ ইত্থি ণ বি এহউ জাণি বিসেসু ॥

[বিশেষভাবে জান যে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নই, বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা শূদ্রও নই, পুরুষ, নপুংসক বা স্ত্রী নই]

যারা মূর্খ, যাদের মধ্যে বোধিজ্ঞান বিস্ফুরিত হয় নি তাদের মধ্যেই ভেদজ্ঞান প্রবল। গৌর বা শ্যাম, দুর্বল বা স্থূল ইত্যাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান তারাই পোষণ করে। পণ্ডিত ও মূর্খ, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, গুরু ও শিষ্য প্রভৃতির মধ্যে সত্যকার কোনো প্রভেদ নেই। কার্য কারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, স্বামী ভৃত্য বা উত্তম নীচের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। পুণ্য পাপ কাল আকাল ধর্ম অধর্ম কিছুই নেই। পাহুড়দোহা কোনো দর্শনকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। জৈন দর্শনকেও নয়। তিনি বলেছেন—মূর্খেরাই যড়্দর্শন পাঠ করে, তাতে ভ্রান্তি বিনষ্ট হয় না। একই দেবতাকে ছ'ভাগ করলে কি মোক্ষ লাভ হয়?

[বোহিবিবজ্জিউ জীব তুহুঁ বিবরিউ তচ্চু মুণেহি।...
হউঁ গোরউ হউঁ সামলউ হউঁ ভি বিভিন্নউ বণ্ণি।
হউঁ তণু অংগউ থুলু হউঁ এহউ জীব ম মণ্ণি ॥
ণ বি তুহুঁ পংডিউ মুক্‌খু ণ বি ণ ঈসর ণ বিণীসু।
ণ বি গুরু কোই বি সীসু ণ বি কম্ম বিসেসু ॥—
পুণ্ণু বি পাউ বি কালু ণহু ধম্মু অহম্মু ণ কাউ।
এক্কু বি জীব ণ হোহি তুহুঁ মিল্লিবি চেয়ণ ভাউ ॥]

বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে এই ভাবকে অদ্বয়জ্ঞান বলা হয়েছে। এই অদ্বয়জ্ঞান উৎপন্ন হলেই 'সহজ' জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই সহজ জ্ঞানই হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকের কাম্য।

বহিরঙ্গের পূজাপার্বণের ব্যর্থতা সম্বন্ধে জৈন দোহায় নানা উক্তি আছে। জিন বলেছেন, বন্দনা কর, বন্দনা কর, কিন্তু নিজের দেহের মধ্যে পরমার্থ লাভ হলে এই বন্দনার কোনো প্রয়োজন নেই (৪১)। এক তীর্থ হতে অন্য তীর্থে ভ্রমণ করলে শুধু সন্তাপই বৃদ্ধি পায় (১৭৮)। যে-যোগী তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়ায় সে জানে না যে শিব তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, অথচ সে তাঁকে পায় না (১৭৯)॥

[বংদহ্ বংদহ্ জিণু ভণই কো বংদউ হলি ইত্থ্।
ণিয়দেহাহং বসংতয়হং জই জাণিউ পরমত্থ্॥
তিত্থইঁ তিত্থ ভমংতয়ইঁ সংতাবিজ্জই দেহু।
অপ্পেঁ অপ্পা ঝাইয়ইঁ ণিব্বাণং পউ দেহু॥
জো পইঁ জোইউঁ জোইয়া তিত্থইঁ তিত্থ ভমেই।
সিউ পইঁ সিহুঁ হংহিঁডিয়উ লহিবি ণ সক্কিউ তোই॥]

বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাপদে বহু স্থানে অনুরূপ উক্তি আছে। সরহপাদ বলেছেন, 'তীর্থ তপোবনে গিয়ে কোনো ফল নেই, জলে স্নান করলেই মোক্ষ লাভ হয় না।'

[কিন্তহ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্খ কি লব্‌ভই পাণী হ্লাই।]

জৈন ধর্মমতে আত্মা বা জীবের স্থান আছে এবং কর্মফল অনুসারে সেই আত্মার শ্বেত, পীত, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণ বা 'লেশ্যা' আছে। কিন্তু পাহুড়দোহায় এ-মতের বিপরীত উক্তি রয়েছে। আত্মা হচ্ছে অজরামর পরব্রহ্ম-স্বরূপ [জো অজরামরু বংভুপরু সো অপ্পাণ মুণেহি]। সে-আত্মার জরা মরণ নেই। কোনো রোগের দ্বারা সে-আত্মা অভিভূত হয় না, তার কোনো বর্ণ বা লিঙ্গ নেই [অত্থি ণ উত্তউ জরমরণু রোয় বি লিংগই বণ্ণ]। যা কর্মফলের প্রভাব হতে মুক্ত নয় তাকে আত্মা বলা চলে না, তাকে আত্মা মনে করলে পরমপদ লাভ করা যায় না। আত্মা জ্ঞানময়, শুদ্ধস্বভাব, বর্ণবিহীন। তাকেই নিরঞ্জন বা শিব বলা হয়। এই জ্ঞানময় আত্মার প্রতি অনুরক্ত হওয়াই হচ্ছে সাধকের একমাত্র কাম্য।

[বণ্ণবিহূণউ ণাণমউ জো ভাবই সব্ভাউ।
সংতু ণিরংজণু সো জি সিউ তহিঁ কিজ্জই অণুরাউ॥]

এই জ্ঞানময় আত্মা কিরূপে লাভ করা যায় সে-কথাও পাহুড়দোহায় আছে। মনকে নিষ্ক্রিয় না করতে পারলে সে-অবস্থা লাভ করা যায় না।

মণু জাণই উবএসডউ জহিঁ সোবেই অচিংতু।
অচিত্তহো চিত্তু জো মেলবই সো পুণু হোই ণিচিংতু॥

[যখন মন চিত্তহীন হয় তখনই এ-উপদেশ বোঝা যায়। সেই চিত্তহীন চিত্ত লাভ করলেই চিন্তাবিহীন হওয়া যায়]।

এই উক্তির স্পষ্ট অর্থ বৌদ্ধ দোহা হতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে নানাস্থানে চিত্ত হনন করবার কথা আছে। যেমন, তিল্লোপাদের দোহাকোষে—

—মারহু চিত্ত ণিব্বাণেঁ হণিয়া।
তিহুঅণ সুণ্ণ ণিরঞ্জন পলিয়া॥ ২ ॥
—এমন মারহু লহু চিত্তে ণির্ম্মূল॥ ৩৩ ॥

চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল, সুতরাং চিত্তের সে-স্বভাব নির্মূল না করলে শূন্য নিরঞ্জন সহজ স্বভাবের স্ফুরণ হয় না। অন্য কথায়, সেই সহজ স্বভাব লাভ করলেই চিত্ত চিত্তহীন বা নিশ্চল হয়। সেই কারণে সরহপাদ বলেছেন—

এহু মণ মেল্লহ পবণ তুরঙ্গ সুচঞ্চল।
সহজ সহাবে সো ধসই হোই নিচ্চল।

[তুরঙ্গ বা পবনের মতো চঞ্চল এই মনকে ত্যাগ কর। সে-মন সহজ স্বভাবে নিশ্চলতা লাভ করে]

মনকে চিত্তহীন করবার উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে পাহুড়দোহার রচয়িতা যা বলেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পংচ বলদ্দ ণ রক্‌খিবই নংদনবণু ণ গও সি।
অপ্প্‌ ণ জাণিউ ণ বি পরু বি এমই পব্বইও সি ॥
পংচহি বাহিরু ণেহডউ হলি সহি লগ্‌গু পিসুস।
তাসু ণ দীসই আগমণু জো খলু মিলিউ পরস্‌স ॥

[তুমি তো পাঁচ বলদ নিয়ে বাইরে বসে আছো, নন্দনবনে প্রবেশ করলে না। নিজেকেও জানলে না, পরকেও জানলে না। এমন প্রব্রজ্যার অর্থ কি ?

হে সখি, বাইরে অবস্থিত পাঁচজনের স্নেহে আবদ্ধ হয়েছ। প্রিয়তমের আগমন দেখতে পাও না, কেননা পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছ।]

'পাঁচ বলদ' বা 'পঞ্চজন' হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাদের প্রভাব হতে মুক্ত না হলে শুদ্ধ স্বভাব জ্ঞানময় আত্মা লাভ হয় না। এ-কথা অনুরূপ ভাষায় বৌদ্ধ চর্যাপদেও বলা হয়েছে—

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীএ পাইঠা কাল। [লুইপাদ]
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজন ঘালিউ। [কৃষ্ণপাদ]
মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল বাহা।
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ। [কৃষ্ণপাদ]

পাহুড়দোহায় আরও বলা হয়েছে—বিষয়-কষায়ে চিত্ত রঞ্জিত হতে থাকলে চিরকাল সংসার-ভ্রমণ করতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করে অনুদিন পরমপদ ধ্যান করা উচিত। তাহলেই সত্যকার সাধনা হবে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বিষয় পরিত্যাগ করতে হলে যোগ-সাধনারও প্রয়োজন আছে। এই যোগ সাধনার কথা পাহুড়দোহায় স্পষ্ট করে বলা নেই, তবে তা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। তার কারণ হয়তো এ-কথা কেউ স্পষ্ট করে বলতে চাইতেন না—

নিজ্জিয় সাসো ণিস্‌ফংদ লোয়ণো মুক্ক সয়ল বাবারো।
এয়াইঁ অবত্থ গও সো জোয়উ ণত্থি সংদেহো ॥

—শ্বাস জয় করলে, নয়ন নিস্পন্দ হলে সমস্ত (বিষয়) ব্যাপার বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় পৌঁছুতে পারলে যোগ হয়।

এই 'শ্বাস' জয় করতে পারলেই মনের ব্যাপার বিনষ্ট হয়। মনের ব্যাপার বিনষ্ট হলে পরমপদ বা নির্বাণ লাভ করা যায়। এ-কথা পাহুড়দোহার রচয়িতা আরও স্পষ্ট করেই পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন।

তুট্টে মনবাবারে ভগ্‌গে তহ রায়রোসসব্‌ভাবে।
পরমপ্পয়ম্পি অপ্পে পরিঠ্‌ঠিয়ে হোই নির্বাণ ॥

মনের ব্যাপার বিনষ্ট হলে, রাগ-রোষের সম্ভাব ভগ্ন হলে আত্মা পরমপদে স্থিতি লাভ করে, তখন নির্বাণ লাভ হয়।

বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে অনুরূপ ভাষায় একই কথা বলা হয়েছে। গুণ্ডরীপাদ একস্থানে বলেছেন যে সমাধিস্থ হতে হলে যোগীকে 'শ্বাসের ঘরে তালা দিতে হয়' [সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল]। সরহপাদ তাঁর এক দোহায় বলেছেন—

জহি মণ পবণ ন সঞ্চরই রবি সসি নাহ পবেস।
তহি বড় চিত্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিস উএস ॥

—চিত্তকে সেইখানে বিশ্রাম করতে দাও যেখানে মন-পবন কিছু সঞ্চরণ করে না, রবি-শশিও প্রবেশ করতে পারে না। সরহ অন্যত্র বলেছেন যে এই স্থানই পরমপদ, নির্বাণ বা পরম মহাসুখ।

পাহুড়দোহায় এই অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—'পরম সুখ হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যেয়, ধারণ, উচ্ছ্বাস কিছুই নেই। সে-অবস্থা প্রাপ্ত হলে সমস্ত গোলমাল বিনষ্ট হয়।'

[মংতু ণ তংতু ণ ধেউ ণ ধারণু।
ণ বি উচ্ছাসহ কিজ্জই কারণু ॥
এমই পরমসুক্‌খু মুনি সুৱই।
এহী গলগল কাসু ণ রুচ্চই ?]

বৌদ্ধ সরহপাদ তাঁর দোহায় ঠিক একই কথা বলেছেন—

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ববি রে বড় বিব্‌ভমকারণ ॥
অসমল চিত্ত ম ঝাণেঁ খরড়হ।
সুহ অচ্ছন্ত ম অপ্পণু ঝগড়হ ॥

—মন্ত্র-তন্ত্র ধ্যান-ধারণা কিছুই থাকে না। কারণ এ-সমস্ত ভ্রমাত্মক। চিত্ত স্বভাবত নির্মল, ধ্যান-ধারণায় তাকে ব্যস্ত করা হয়। সুখের অবস্থায় আত্মাকে বিচলিত করা উচিত নয়।

মনের এই বিলীন অবস্থাকে পাহুড়দোহার রচয়িতা অস্তগমন বলে উল্লেখ করেছেন। [মনু পঞ্চাহি সিতু অত্থবণ জাই]—মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অস্তমিত হয়, মনের এই অবস্থাতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় [পরম তত্তু ফুড্ড তাঁহ জি ঠাই]। মনের এই অবস্থায় 'অবনাগমন' নষ্ট হয়, অর্থাৎ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এই 'অবনাগমন' যতক্ষণ ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পরমতত্ত্বে পৌঁছান যায় না।

অপ্পাপরহঁ ণ মেলযউ আবাগমণু ণ ভগ্‌গু।
তুস কংডতহঁ কালু গউ তংদুলু হত্থি ণ লগ্‌গু ॥

—আত্মপর রূপ ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হয় নি। অবনাগমন বন্ধ হয় নি, সেইজন্য তুষ কুটতে-কুটতে কাল গত হ'ল, চাউলে হাত পড়ল না।

বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদেও আমরা অনুরূপ উক্তি পাই সরহপাদের এক দোহায়—

ণ ফুরই ণঅণ অত্থসই চিত্ত ফুড় তুট্টই ভন্তি।
আবাঅ গই অথ মণ জাই তহ ধারণ ধিয়ন্তি ॥

—তখন নয়ন আর স্ফুরিত হয় না, চিত্ত অস্তমিত হয়, ভ্রান্তি বিনষ্ট হয়। তখন বাক্য স্ফুরণ হয় না, মন অস্ত যায়, ধারণাও সেই অবস্থায় পর্যবসিত হয়।

মোহবিমুক্কা জই মণা
তবেঁ টুটই অবণাগমণা ॥

—যখন মন মোহবিমুক্ত হয় তখনই অবনাগমন বিনষ্ট হয়।

মন অস্তমিত হলে, অবনাগমন শেষ হলে যে-ভাবের উদ্রেক হয় তাকে পাহুড়দোহার রচয়িতা 'সমরস' বলেছেন। তখন মন ও পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ মিল সাধিত হয়, মন পরমেশ্বরে মিলিত হয়, আর পরমেশ্বর মনের সঙ্গে মিলিত হন। উভয়ের এই মিলনই হচ্ছে সমরস, তখন আর কাউকে পূজা করবার আবশ্যকতা থাকে না।

[মণু মিলিষউ পরমেসরহো পরমেসরু জি মণস্‌স।
বিণ্ণি বি সমরসি হুই রহিঅ পুজ্জ চড়াবউ কস্‌স ॥]

এই মিলন এত সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয় যে তখন উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ ভেদ থাকে না।

[জিম লোণু বিলিজ্জই পাণিয়হঁ তিম জই চিত্ত বিলিজ্জ] চিত্ত তখন এমনভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন হয়।

এই উদাহরণ সরহপাদের দোহাতেও আছে—

অলিঅ ধম্ম মহাসুহ পইসই
লবণ জিম পাণীহি বিলিজ্জই ॥

—লবণ যেমন জলে বিলীন হয়, অলীক ধর্মসমূহ তেমনি মহাসুখে বিলীন হয়।

এই অবস্থাকে বৌদ্ধ দোহাকারগণও 'সমরস' বলেছেন। সমরস ও সহজানন্দ তাঁদের মতে সমার্থক। সরহপাদ এই অবস্থাকে বলেছেন - 'তখন শ্রবণ শুনতে পায় না, নয়ন দেখতে পায় না, পবন বইতে থাকে কিন্তু বিচলিত করে না, ঘন বৃষ্টি হয় কিন্তু নিমজ্জিত করে না, তখন ক্ষয়-বৃদ্ধি কিছুই থাকে না, গতিবিধি থাকে না। একেই সমরস ও সহজানন্দ বলে।' এই সহজাবস্থার কথা পাহুড়দোহার রচয়িতা জানেন। কারণ এক দোহায় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'হে যোগী, সহজাবস্থা লাভ করে ইন্দ্রিয়রূপ করভকে নিবারণ কর।' বৌদ্ধ দোহায় বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা 'শূন্য'কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মতে সমস্তই শূন্য স্বভাব—'হউঁ সুণ্ণ জও সুণ্ণ তিহুঅণ সুণ্ণ' [আমি শূন্য, জগৎ শূন্য, ত্রিভুবনও শূন্য]। সহজানন্দ বা সমরস উৎপন্ন হওয়া এবং শূন্য স্বভাব হওয়া একই কথা। জৈনধর্মে এ-শূন্যতার কোনো স্থান নেই, তথাপি পাহুড়দোহার রচয়িতা এই শূন্যতাকে ছাড়তে পারেন নি—

সুণ্ণং ণ হোই সুণ্ণং দীসই সুণ্ণং চ তিহুবণে সুণ্ণং।
অবহরই পাবপুণ্ণং সুণ্ণ সহাবেণং গও অপ্পা ॥

—শূন্য শূন্য নয়, শূন্য হতেই শূন্য দেখা যায়। ত্রিভুবন শূন্য। পাপ শূন্য সমস্তই এই শূন্য স্বভাবে বিলীন হয়।

এই তুলনামূলক বিচার হতেই বোঝা যাবে মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতীয় ধর্মসমূহের মধ্যে নানা প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সাধন বিষয়ে কতটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

চর্যাগীতি

বৌদ্ধগান বা চর্যাগীতি[১] যে বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সে-বিষয়ে বর্তমানে আর পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিছুকাল পূর্বে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এবং পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ-চর্যাগুলির ভাষা প্রাচীন মাগধী বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেন, কেউ বা প্রাচীন মৈথিলী, কেউ বা প্রাচীন ওড়িয়াও বলতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কেউই নিজস্ব উক্তি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন নি, উক্তি সমর্থনযোগ্য নয় বলেই তা সম্ভব হয় নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ও এ-পদগুলির পুঁথি নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালার অধ্যক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

শাস্ত্রীমহাশয় এই গ্রন্থের নাম দেন—'বৌদ্ধ গান ও দোহা'। বৌদ্ধগানগুলি ছাড়া ওই গ্রন্থে প্রাচীন অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত সরহপাদের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব নামক তিনখানি গ্রন্থ আছে। শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধগান ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা অভিন্ন মনে করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শহীদুল্লাহের আলোচনায় এই দুই গ্রন্থের ভাষার বিভিন্নতা ধরা পড়ে। গানগুলির ভাষাই যে কেবল প্রাচীন বাংলা তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষা অপভ্রংশ। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষের ভাষার বিশদ আলোচনা করেন এবং এই দুই গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে অর্থবোধের চেষ্টা করেন (**Les Chants Mystiques des Kānha et Saraha, Paris, 1928**)। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুরূপ প্রণালীর দ্বারা ডাকার্ণবের পাঠ ও অর্থ নির্ধারণ করেন (**Dakarnava, Calcutta Sanskrit series, 1935**)। উভয়েই এ-গ্রন্থগুলির ভাষাকে অপভ্রংশ বলেন। কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতকে বা তার পরেও নানা প্রাদেশিক অপভ্রংশ সাহিত্যের বাহন হয়েছিল। উত্তরভারতে শৌরসেনী অপভ্রংশের বাহুল্য লক্ষিত হয়। প্রাচ্য দেশসমূহের মাগধী অপভ্রংশেরও প্রচলন ছিল। কিন্তু সে-অপভ্রংশের নিদর্শন খুব অল্পই পাওয়া যায়।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন যে দোহাকোষগুলির ভাষা মাগধী অপভ্রংশ। যে-সমস্ত পাঠের উপর নির্ভর করে তিনি এই উক্তি করেন দোহাকোষের নূতন পুঁথিতে তার কোনো সমর্থন

---

১ বৌদ্ধগানগুলির প্রকৃত নাম যে চর্যাগীতি ছিল তা আমি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছি। সাধারণত এই গানগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়, আমিও পূর্বে তা করেছি। কিন্তু একে চর্যাগীতি বলাই প্রশস্ত, কারণ একটি চর্যাগীতির মধ্যে চার-পাঁচটি পদ রয়েছে, সেগুলিকে পদ ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সংস্কৃত টীকাতেও সেগুলিকে পদ বলা হয়েছে। গানগুলি হচ্ছে চর্যাগীতি আর সে-গীতি কয়েকটি 'পদ'-এর সমষ্টি নিয়ে গঠিত।

পাওয়া যায় না। আমি ১৯২৯ সালে নেপালের পুঁথিশালায় অনুসন্ধানের ফলে দোহা-কোষের কতকগুলি নূতন পুঁথি পাই। পুঁথিগুলি খুব প্রাচীন, খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগের, খুবসম্ভব মূল গ্রন্থের সমসাময়িক। এই পুঁথিগুলির সাহায্যে যে নূতন পাঠ স্থির করা সম্ভব হয় তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে দোহাকোষের ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ। অতি প্রাচীনকাল হতেই শৌরসেনীর এই ব্যাপক প্রভাব হতে উত্তর ভারতের কোনো সাহিত্যই মুক্ত ছিল না।

দোহাকোষের ভাষা চর্যাগীতির ভাষা হতে পৃথক হলেও উভয়ই যে একই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্প্রদায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট শাখা যাকে কখনো 'বজ্রযান' কখনো বা 'সহজযান' আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুত বজ্রযান ও সহজযানের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকলেও এখনো তা স্পষ্ট ধরা যায় নি। এই দুই সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি ও প্রচলন বঙ্গ ও মগধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তা নেপাল ও তিব্বতে প্রচারিত হয়। সেই কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের পুঁথিপত্র বর্তমান-কালে নেপাল ও তিব্বতেই বেশি পাওয়া যায়। ওইসব দেশে বজ্রযানের পৃথক অস্তিত্বও রয়েছে, কিন্তু বঙ্গদেশ হতে তা লুপ্ত হয়েছে। তবে ওই সম্প্রদায়ের সাধনার ধারা যে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার মধ্যে যথেষ্টভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

চর্যাগীতি বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলেও এ-পর্যন্ত তার কোনো প্রামাণিক সংস্করণ তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তার প্রধান কারণ চর্যাপদের একাধিক পুঁথি পাওয়া যায় নি। মূল পুঁথি আছে নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায়। শাস্ত্রীমহাশয় সেই পুঁথির যে-অনুলিপি সংগ্রহ করে আনেন সেই অনুলিপিই ছিল তাঁর সংস্করণের মূল ভিত্তি। এই অনুলিপি **Royal Asiatic Society of Bengal**-এর পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে। এই অনুলিপি প্রস্তুত করেন নেপালী পণ্ডিত। সেইজন্য নেপালীদের কয়েকটি সাধারণ লিপিকরপ্রমাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্করণে প্রবেশ করেছে। এই সাধারণ লিপিকরপ্রমাদের মধ্যে দু-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'স' এর স্থানে 'ষ' (যবহর, ষহজ), 'উ' এর স্থানে 'ত' (তআরি) 'ঢ়' স্থানে ট' (দিট গটই, বট) ইত্যাদি। ১৯৩০ সালে নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালায় মূল পুঁথি আমার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে অনুলিপির মধ্যে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মূল পুঁথি ব্যতিরেকে ওই গ্রন্থের কোনো প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

চর্যাগীতির প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করার আর-একটি অন্তরায় গ্রন্থের ভাষা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শহীদুল্লাহের আলোচনায় ওই ভাষার সঙ্গে এখন আমাদের অনেকটা পরিচয় হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে এখনো যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এই অনিশ্চয়তার সমাধান তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন।

চরম সংস্করণ প্রণয়নে আর-একটি বাধা হচ্ছে অর্থবোধ। যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনপন্থা এইসব চর্যায় বর্ণিত হয়েছে সে-সম্প্রদায় এবং তার ধর্মমতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো সীমাবদ্ধ। ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর দোহাকোষের ভূমিকায় এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রথম আলোচনা করেন (**Les Chants Mystiqes···1928**)। এর কয়েক

বৎসর পরে আমিও কতকগুলি প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের জটিল ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করি (**Some Aspects of the Buddhist mysticism in the Caryapadas, Some Technical terms of the Tantras, The Sandhābhāsā and Sandhāvacana**)। এই প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (**Studies in the Tantras, Calcutta University, 1939**)। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা এ-সম্প্রদায়ের ধর্মমত যে সমগ্রভাবে বোঝা গিয়েছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযান সম্প্রদায়ের অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এ-সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এ-ধর্মমত মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যবাদ বা পরবর্তী কালের নাথপন্থী ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনপন্থার সাহায্যে বোঝা যায় না। চর্যাপদের সাধনপন্থার দার্শনিক ভিত্তি যে প্রাচীন মহাযান ধর্মমতের মধ্যে অন্তর্নিহিত তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার মধ্যেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার দ্বারা ওই সাধনপন্থার ঐতিহাসিক ক্রম নির্ণয় করাই চলে, তাকে সমগ্রভাবে বোঝা চলে না। তা ছাড়া ওই সাধনপন্থার অনেকাংশ ছিল গুরুমুখী, সিদ্ধাচার্যদের সেই গুরুমুখী ধারা যে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় রক্ষা করেছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। পুঁথিপত্রের সাহায্যে এ-অভাব খানিকটা দূর করা যায় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না।

কোন্-কোন্ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ এই সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করতে পারে তার কিছু উল্লেখ চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই টীকার প্রথমাংশ যতটা যত্ন-সহকারে রচিত হয়েছিল শেষাংশ তা হয় নি। প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ এই প্রথমাংশেই পাওয়া যায়। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। টীকার রচনাকাল আমরা জানি না। তবে মুনিদত্ত যে দ্বাদশ শতকেব পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। তিনি যে চর্যাসাধনার সমস্ত ধারার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন তা মনে করবারও কোনো কারণ নেই। তাঁর টীকা চর্যাপদের ভাষাগত নয়, ভাবগত। সেই কারণে চর্যাপদের শব্দাথ এই টীকায় পাওয়া যায় না, যদিও সে-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দুর্ল'ভ নয়। টীকায় চর্যাপদের উল্লিখিত চর্যা বা সাধনপন্থাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সে-ব্যাখ্যাও এত অস্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে যে অসম্প্রদায়িকের পক্ষে তার মধ্যে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নয়। যে-সব গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা প্রামাণিক করবাব চেষ্টা হয়েছে সে-সব গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া গেল—

১। অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ ২। আগম ৩। অদ্বয়সিদ্ধি ৪। অনুত্তরসিদ্ধি ৫। একশ্লোক ভগবতী (প্রজ্ঞাপারমিতা) ৬। চতুর্দেবী পরিপৃচ্ছা মহাযোগতন্ত্র ৭। জ্ঞানসম্বোধি ৮। গুহ্যসমাজ ৯। মাধ্যমক শাস্ত্র ১০। প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ ১১। প্রবন্ধ ১২। দ্বিকল্প ১৩। নামসংগীত ১৪। নিদত্তক ১৫। যোগরত্নমালা ১৬। রতিবজ্র ১৭। বহিঃশাস্ত্র ১৮। বজ্রজাপ ১৯। বোধিচর্যাবতার ২০। সূতক ২১। সহজসম্বর ২২। সেকোদ্দেশ ২৩। সম্পুটোদ্ভব তন্ত্ররাজ ২৪। হেরুকতন্ত্র ২৫। হেবজ্রতন্ত্র ২৬। শ্রীসমাজ।

এ ছাড়া নানা গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে,—আর্যদেব, নাগার্জুন, শান্তিদেব, দউড়ীপাদ (এই নাম লিপিকরপ্রমাদে নানাস্থানে দবড়ী, ইউড়ী, দড়তী ইত্যাদি রূপে দেখা যায়), মীননাথ, ধোকড়িপাদ, কৃষ্ণাচার্য, তিল্লোপাদ, বিরূপাক্ষ, ভুসুকু। উপরন্তু

চর্যাপদগুলির রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের প্রণীত আরও অনেক গ্রন্থ হয় পুঁথিতে না হয় তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়। সেগুলিও সিদ্ধাচার্যদের সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করে। এই সমস্ত গ্রন্থ পুনরুদ্ধার না করলে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত সুস্পষ্ট ও সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

চর্যাপদের পাঠনির্ণয়ে দ্বিতীয় পুঁথি এবং শব্দগত টীকার অভাব দূর করা সম্ভব হয় তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান পূর্বেও করা হয়েছিল—কিন্তু সে-অনুসন্ধান সফল হয় নি, তার কারণ গ্রন্থের প্রাচীন নাম যে কি ছিল তা তখনো ঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তিব্বতী 'তাঞ্জুর' সংগ্রহে অন্য গ্রন্থের অনুবাদ সন্ধান করতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমি চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের খোঁজ পাই। অনুবাদের নাম—**Spyod pa'i glu'i mdsod kyi 'grel pa shes bya ba (Tanjur, rgyud—'grel XLVII, 35)**। অনুবাদে সংস্কৃত নাম উল্লিখত হয়েছে—'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। এই গ্রন্থে চর্যাপদের মূল ও টীকা উভয়েরই অনুবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্র সাতচল্লিশটি পদ পাওয়া যায় পুঁথি খণ্ডিত বলে ২৪, ২৫ ও ৪৮-সংখ্যক পদ নেই। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে পঞ্চাশটি পদই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

এই তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে আমি প্রথমে চর্যাপদগুলির মূলের অর্থ ও পাঠনির্ণয়ের চেষ্টা করি ও আমার তুলনামূলক বিচারের প্রথম খণ্ড ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করি (**Materials for a critical edition of the Bengali Caryāpadas, part I, Journal of the Dept. of Letters 1938, pp. 1-156 ; Calcutta University**)। এই প্রবন্ধে আমি তিব্বতী অনুবাদের একটি আনুবর্ণিক সংস্কৃত অনুবাদ এবং এই অনুবাদ এবং সংস্কৃত টীকার সাহায্যে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করবার চেষ্টা করি। গ্রন্থশেষে চর্যাপদের সংশোধিত পাঠও দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত টীকার তিব্বতী অনুবাদ আলোচনা করে টীকার পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের ইচ্ছা ছিল, কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু এখনো তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সংশোধিত পাঠ দেওয়া সত্ত্বেও আমার গ্রন্থ যে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, সে-সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। সেইজন্যই আমি আমার নিবন্ধের নামকরণ করি **Materials for a critical edition**। আমার নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েক বৎসর পরে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন **Buddhist Mystic Songs (Dacca University Studies, 1940)**। তিনি তাঁর গ্রন্থে চর্যাগুলির যথাসম্ভব সংশোধিত পাঠ, বিশেষ বিশেষ শব্দের আলোচনা ও ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেন। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে আমার সংশোধিত পাঠগুলি তিনি গ্রহণ করেন এবং নূতন আলোচনার দ্বারা অনেক স্থলে সুসংগত নূতন পাঠও স্থির করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর এই গ্রন্থকে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি। এই সমস্ত প্রচেষ্টা যদি চর্যাপদের প্রাথমিক সংস্করণ-প্রণয়নে সাহায্য করে তাহলেই তাদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

সম্প্রতি মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় চর্যাপদের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (চর্যাপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৫।০+২১০)। এ-গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও গৃহীত হয়েছে। ভূমিকায় তিনি গ্রন্থপরিচয় দিয়েছেন এবং চর্যার ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, গ্রন্থশেষে শব্দসূচী

এবং শব্দার্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে মূল পদগুলির ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ, মর্মার্থ এবং টীকা দেওয়া হয়েছে। মর্মার্থে প্রত্যেক পদের ধর্মতত্ত্ব এবং টীকার বিশেষ বিশেষ শব্দের আলোচনাও করা হয়েছে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তিনি সংস্কৃত টীকা অবলম্বন করে চর্যার পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'প্রায় সর্বত্রই আমি এই টীকা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। চর্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই টীকাটি যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।'

মণীন্দ্রবাবু এই নূতন সংস্করণ-প্রণয়নে যে পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থ সুধীসমাজে চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে বলেই তার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ এই আলোচনা কিংবা সমালোচনার দ্বারাই চর্যাপদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্ধারণের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হতে পারি। এ-বিষয়ে কোনো গ্রন্থকারেরই কোনো মৌলিকত্বের দাবি রাখা সংগত নয়, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তার পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করা প্রয়োজন।

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে প্রায় তিন শত বিয়াল্লিশটি নূতন পাঠ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় দুই শত চল্লিশটি আমার সংশোধিত পাঠ। যদিচ তিনি তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি তাতে কিছু আসে যায় না। আমার প্রচেষ্টা যে তাঁর পাঠনির্ধারণে সাহায্য করেছে তাতেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করি। আমি পূর্বেই বলেছি যে আমার পাঠ নির্ধারিত হয় মুখ্যত তিব্বতী অনুবাদের এবং অংশত সংস্কৃত টীকার সাহায্যে। যদিও মণীন্দ্রবাবু আমার এইরূপে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদের উপর তাঁর কোনো আস্থা নেই। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন (পৃঃ।৵০)—'কিন্তু প্রবোধবাবু লিখেছেন **I found out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of the Tibetan text** (খ, পৃঃ ৬)। এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। চর্যাপদগুলির এবং তাহাদের টীকার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। টীকা রচিত হইবার কতকাল পরে এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ধর্মতত্ত্বে প্রবেশাধিকার কিরূপ ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। এ-অবস্থায় মূল সংস্কৃত টীকাটি যে তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত টীকার ব্যাখ্যা ও অর্থের সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে অনুবাদক যেন অনেক স্থানেই অর্থগ্রহণ করিতে পারেন নাই।'

মণীন্দ্রবাবুর এ-উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে তিব্বতী অনুবাদের কোনো মূল্য থাকে না। তিব্বতী অনুবাদ দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকে করা হয়েছিল। সে-অনুবাদ যে ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী নয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তিব্বতী অনুবাদও করেন তিব্বতী লামার সহায়তায় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত। এই পণ্ডিতের নাম মহাপণ্ডিত কীর্তিচন্দ্র। অনুবাদের স্থান নেপালের স্বয়ম্ভুনাথ (**Cordier, Catalogue II, p. 225**)। সুতরাং সেখানে যে আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অতএব অনুবাদক যে চর্যাপদের অর্থবোধ করতে

পারেন নি তা মনে করা অসংগত। তিব্বতী অনুবাদকের নিকট যে অন্য একখানি পুঁথি ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ চর্যাপদের বর্তমান পুঁথিতে যে তিনটি চর্যা নেই (সংখ্যা ২৪, ২৫, ৪৮) তিব্বতী অনুবাদে তা পাওয়া যায়; ত্রয়োদশ চর্যার মূল বর্তমান পুঁথিতে আছে, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে তা নেই।

তিব্বতী অনুবাদের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে মণীন্দ্রবাবু যে-উদাহরণ দিয়েছেন তার বিচার করা প্রয়োজন। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে ৩৩ সংখ্যক চর্যায় প্রথম চার পঙ্‌ক্তি—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ গ। সংসার বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি চেণ্টে যামাঅ॥

তিব্বতী অনুবাদকে সংস্কৃতে রূপান্তর করলে এইরূপ দাঁড়ায়—'নগরমধ্যে মম গৃহং, প্রতিবেশী নাস্তি। মৃদ্‌ভাণ্ডে ওদনং নাস্তি নিত্যং আবেশনং। ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ। দুগ্ধদুগ্ধং কিং গোস্তনং প্রবিশতি।' তৃতীয় পঙ্‌ক্তির সংশোধন না করলে অর্থ হয় 'বেঙ্গের সংসার বেড়ে যায়।' তাহলে তিব্বতী অনুবাদ কি ভ্রমাত্মক? আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে তিব্বতী অনুবাদকের নিকট ভিন্ন পাঠ ছিল। মণীন্দ্রবাবু বলেছেন যে সংস্কৃত টীকার সাহায্যে বেশ বোঝা যায় যে তিব্বতী অনুবাদক লাইনটির কদর্থ করেছেন। সংস্কৃত টীকায় আছে—'বিগতমঙ্গং যস্য স ব্যঙ্গঃ, অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাবং বোদ্ধাব্যং। অঙ্গস্য ষড়্‌গতৌ সয়তি গচ্ছতীতি স সয়ঃ তদেব বায়ুরূপং। তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিত।' এখানে 'ব্যঙ্গ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া হচ্ছে, 'যার অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে বা যা শূন্যস্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভাস্বর।' টীকার তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে যে 'সেই ব্যঙ্গ বা প্রভাস্বরের দ্বারা বিজ্ঞান চালিত হচ্ছে।' এই বিজ্ঞা. কে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে-কথা দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে—'সয়তি গচ্ছতীতি স সয়ঃ, তদেব বায়ুরূপং'। মণীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনায় এ-লাইনটির কোনো উল্লেখ করেন নি, কারণ তার অর্থবোধ করা যায় না। অথচ 'মর্মার্থ'-নির্ধারণে এ-লাইনটির যে বিশেষ তাৎপর্য আছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। এই অংশটির পাঠনির্ণয় টীকার তিব্বতী অনুবাদ হতেই সম্ভব হয়—এর তিব্বতী অনুবাদ হচ্ছে —**brgyan sin 'go ba'i phyir sbrul lo ; de nid rlun gi no bo**। একে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—'সর্পতি (সন্তয়তি বা) গচ্ছতীতি সর্পঃ; তদেব বায়ুরূপং'। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে টীকায় 'সয়তি' এবং 'সয়ঃ' লিপিকরপ্রমাদ—টীকার তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে তাদের সংশোধন করতে হবে 'সর্পতি' এবং 'সর্পঃ'। এই সর্পকে তার বিশেষ গতির জন্য বায়ুর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিজ্ঞানের' সাংবৃতিক রূপও তাই; বিজ্ঞান = বায়ু = সর্প; বেঙ্গ = ব্যঙ্গ = প্রকৃতিপ্রভাস্বর। এই প্রকৃতিপ্রভাস্বরের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ সর্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—অতএব 'ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ'। সেই কারণেই আমি মূলপাঠ সংশোধন করেছিলাম 'বেঙ্গস সাপ বড়্হিল জাঅ'। অতএব যে-টীকার সাহায্যে মণীন্দ্রবাবু তিব্বতী অনুবাদের মূল্য খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন সেই টীকাই এ-পাঠকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। আমরা এই প্রস্তাবিত পাঠের আর কোনো সংশোধন প্রয়োজন আছে কিনা অর্থাৎ 'বেঙ্গস সাপ' হবে, না 'বেঙ্গ সাপস' হবে, তা

ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বলতে পারেন। আমার নিকট অর্থ সুস্পষ্ট—'ব্যাঙ্গ ও সাপের মধ্যে যে লড়াই চলছে তাতে ব্যাঙ্গই সাপকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে'। এ-অর্থেই paradox সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মণীন্দ্রবাবু তাঁর সংস্করণে তিন শত বিয়াল্লিশটি নূতন পাঠের মধ্যে আনুমানিক এক শতটি স্বতন্ত্র পাঠ দিয়েছেন। এ-পাঠগুলিও ঠিক তাঁর নিজস্ব নয়, কতকগুলি পাঠে মূল পুঁথির লিপিকরপ্রমাদগুলিই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন—ষষহর, ষহজ (২৭); ষাম্বাঅ, ষা, ষিআলা, ষিহে, ষম (৩৩), বুঝিষ (৪১); বট (৩৬, ৩৯)।[২] কতকগুলি নূতন পাঠের সমর্থনে কোনো যুক্তি দেওয়া হয় নি—থাঅ, চোরে (২); সান্ধে, কান্ধে (৩); ঘাণ্টি, পিবমি (৪); ভবণই পাটী (৫); দীসঅ (৬); বাহিরি, জাহ সো, চৌষঠ্‌ঠী (১০); খট্টে (১১); লাগিরে (১৬); উছলিআ চলিআ (১৯); ফিটলিউ, অন্তউরি, ভইলেসি (২০); আকারা, আহারা, গাতি, কাল, তাবসে (২১); ভাইব (২৯); তৈলোঅ (৩০); করুণা, রাজই, পাড়িভাইস, পইসই (৩১); ভাইলা (৩২); করুণরি, অলকৃখলকৃখই চিত্তা (৩৪); অচ্ছিলেঁ, মকুঁ, সব্বই (৩৫); মা (৩৭); মেল (৩৮); বিদারঅ (৩৯); ভান্তিএঁ, সসরসিংগে, সহাব (৪১); তৈলোএ (৪২); ইত্যাদি।[৩] এগুলি প্রধানত মূল পুঁথির পাঠ; কোথাও ছন্দের মিলের খাতিরে, কোথাও বা ব্যাকরণসাম্য রক্ষার জন্য এ-সব পাঠ সংশোধন করা হয়েছিল, কিন্তু মণীন্দ্রবাবু কোথাও মূল পাঠ রেখেছেন, কোথাও সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন, ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য রক্ষার কোনো চেষ্টা করেন নি। দুই-একটি প্রমাণ দিলেই তা বোঝা যাবে। দীসঅ (৬)—আমি সংশোধন করেছিলাম 'দীসই', পরবর্তী লাইনের 'পইসই'র সঙ্গে ছন্দোগত মিলের জন্য। খট্টে (১১)—আমার সংশোধিত পাঠ 'খাটে', কারণ পরের লাইনে আছে 'বীরনাদে' (হয়ত শুদ্ধ পাঠ 'বীরনাটে'); ভাইব (২৯)—আমার সংশোধিত পাঠ 'ভাবই' কিন্তু মণীন্দ্রবাবু বলেছেন ভাইব = ভাব্য; মূল—লুই ভণই [মই] ভাইব কিসঃ সংস্কৃত টীকায় 'ময়া কিং ভাব্যম্'; মণীন্দ্রবাবু অনুবাদ করলেন—'মোর ভাব্য কিছু নাই'। এ-অনুবাদ যে মোটেই ব্যাকরণসম্মত নয় তা মণীন্দ্রবাবুও স্বীকার করবেন। অন্তউরি (২০)—মূলে ছিল 'অন্ত উড়ি', সংশোধিত পাঠ 'অন্তউড়ি', মণীন্দ্রবাবু লিখলেন—'অন্তউরি'। 'র' ও 'ড়' এর মধ্যে কি কোনো ধ্বনিগত পার্থক্য নেই? এই কয়েকটি উদাহরণ হতেই তাঁর বানানগত সংশোধনের ভিত্তি যে অতি শিথিল তা বোঝা যাবে।

বাকি কতগুলি পাঠে মণীন্দ্রবাবু মৌলিকত্ব দাবি করতে পারেন। অতএব সে-পাঠগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। মূল পুঁথিতে কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি শব্দের প্রাকৃত রূপ, যথা—কাড্‌ডিঅ, নিয়ড্ডী (৫), মোড্‌ডিউ (৯)। এগুলিকে তিনি

২। আমার সংশোধিত পাঠ—শশহর, সহজ, সামায়, সা, সিআলা, সিহে, সম, বুঝিসি, বঢ়।

৩। আমার সংশোধিত পাঠগুলি যথাক্রমে—থাই চৌরী (২), সান্ধে, কান্ধে (৩), ঘাণ্টি, পাবমি (৪), ভবনই, পটি (৫), দীসই (৬), বাহিরে, জাইসো, চৌষঠী (১০), খাটে (১১), বাগেলি রে (১৬), উছলিলা, চলিলা (১৯), ফিটলে, অন্তউড়ি, ভইলে সি (২০), অচারা, অহারা, গাত্তী, কালা, তবসে (২১), ভাবই (২৯), তিলোএ (৩০), করুণ, রাজঅ, পড়িভাসঅ, পইসঅ (৩১), ভইলা (৩২), করুণ রে অলকৃখ লক্‌খই চিএ (৩৪), অচ্ছিল, মোকু, সর্ব্বদাই (৩৫), নাহি (৩৭), মেলি (৩৮), বিদারিঅ (৩৯), ভন্তিএঁ, সসসিংগে সহাবা (৪১), তিলোএ (৪২)

সংশোধন করেছেন ফাড়িঅ, নিয়ড়ি, মোডিউ। এ-সংশোধনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ ওগুলি প্রাকৃত শব্দ হিসাবেই গ্রহণ করা চলে।

(৩) মূল—সডুলী, লিপিকরপ্রমাদে 'ঘ' 'স' হয়েছে—আমার সংশোধিত পাঠ ঘডুলী, সংস্কৃত টীকায়—ঘডুলী ; মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন ঘড়লী এবং তার পূর্বে 'সে' শব্দ যোগ করেছেন।

(৫) মূ[৪]—কোহিঅ, মণীন্দ্রবাবু—কোরিঅ—অর্থ 'দৃঢ় কর'। কিন্তু টাঙ্গীর কাজ তো দৃঢ় করা নয়, কাটা। সুতরাং 'কোহিঅ' এমন কোনো শব্দ যার অর্থ ছিল 'কাটা'। তিব্বতী অনুবাদে—phugs 'ভিদ্যতাম্' ; শহীদুল্লাহ্—'কোহিঅ' শব্দকে সংশোধন করেছেন—'কোড়িঅ'। পূর্ব পংক্তির "জোড়িঅ" শব্দের সঙ্গে তার মিল খুব বেশি। তিনি বলেছেন যে Middle Bengal-তে—কোড় = খোঁড়া (digging) অর্থে পাওয়া যায় ; তাঁর এ-সংশোধন অনেক বেশি যুক্তিসংগত। কিন্তু তবুও সন্দেহ থাকে—টাঙ্গি দিয়ে খোঁড়া হয় না, কাটা হয়।

(৭) মূ—মোহিঅই, প্রঃ—মো হিঅহি, তিব্বতী—bdag gi sñen mi—'মম হৃদয়ে'. মণীন্দ্রবাবু—মোহহেতু ; তাঁর মতে মোহিঅই = সংস্কৃত মোহিতোঽপি।

(১৮) মূ—ডোম্বী তআগলি, প্রঃ—ডোম্বী ত আগলি,—'রে তোম্বী তোর চাইতে'। শহীদুল্লাহ্ও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। পূর্ব পদেও ডোম্বীকে সম্বোধন করা হয়েছে—'তোহোরে বিরুআ বোলই···তোরে কণ্ঠ ন মেলই'। মণীন্দ্রবাবু—'ডোম্বীত আগলি'—তিনি যুক্তি দিয়েছেন 'অধিকরণে প্রযুক্ত অন্তজাত ত-যোগে এখানে অপাদানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে'। অপাদান না হয়ে সম্বোধন হলে এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য থাকে কিনা তা তিনি বিচার করেন নি।

(২০) মূ—জান জোবন মোর ভইলেসি পূরা—প্রঃ—জা ন জোবন মোর ভইলে সি পূরা—'আমার যে নবযৌবন তা পূরা [= সার্থক] হইল'। তিব্বতী অনুবাদও এই অর্থ সমর্থন করে। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু—'জাণ জোবন···'—'বিজ্ঞান যৌবন মোর যবে পরিপূর্ণ হ'ল'। বিজ্ঞান কি করে 'জাণ' হয় তা বোঝা শক্ত। চর্যায় প্রথমে 'পহিল বিআণ' এবং আনুষঙ্গিক আনন্দ ও অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। নবযৌবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করলে অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

(৩০) মূ—এত বিষারা, প্রঃ—এত বি সারা—'এই-ই সার (পদার্থ)'। তিব্বতীও এইরূপ পাঠ সমর্থন করে। মণীন্দ্রবাবু—'এত বিসারা—এতই বিস্তার'। কিসের বিস্তার ? মণীন্দ্রবাবু বলেছেন 'আনন্দের'। কিন্তু পদে 'আনন্দের' কোনো উল্লেখ নেই। 'এ তৈলোএ এত বি সারা'। সংস্কৃত টীকার 'নান্যোপায়োঽস্তি'র অর্থও হচ্ছে—এইটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। মণীন্দ্রবাবুর পাঠের সমর্থন সংস্কৃত টীকাও করে না।

(৩২) মূ—গজিই, প্রঃ—মজিই ; টীকায়—'সংসারসমুদ্রে মজ্জন্তি', তিব্বতী অনুবাদে—সানন্দে যায় অর্থাৎ 'মজে'। মণীন্দ্রবাবু মূলপাঠ 'গজিই' রেখেছেন, অনুবাদ করেছেন—'যায়', শব্দসূচীতে লিখেছেন 'গজিই ? টীকা—অনুগম্যতে।' টীকায় কোথাও 'অনুগম্যতে' নেই। 'গজিই' পদ সম্বন্ধে যদি সন্দেহই থাকে তবে মজিই পাঠ গ্রহণ করায় আপত্তি কি ?

৪। মূ—মূল পাঠ, প্রঃ—আমার সংশোধিত পাঠ।

(৩৩) মূ— সো ধনি বুধী ; প্রঃ— সো ধনি বুধী, আমার এ-সংশোধিত পাঠ ভুল, কারণ তিব্বতীতে আছে— 'যঃ প্রাজ্ঞঃ স এব প্রজ্ঞাহীনঃ'='জো সো বুধী সো নিবুধী'। মণীন্দ্রবাবুর 'শোধ নিবুধী'র 'শোধ' অর্থহীন।

(৩৫) মূ— পণিআঁ ; প্রঃ— পণিআ ; তিব্বতী অনুবাদের অর্থ— 'গগনসমুদ্র আমার দ্বারা ভক্ষিত হইল'। মণীন্দ্রবাবু পণিআ সংশোধন করে পসিআ লিখেছেন। তাঁর মতে পদটি হচ্ছে 'মই অহারিল গঅণত পসিআ'='গগনসমুদ্রে আমি করেছি প্রবেশ'। এ-অনুবাদ যে কী করে হয় তা বলা কঠিন। 'অহারিল'— প্রধান ক্রিয়া ; তার কর্ম কোথায় ? 'পসিআ'='প্রবেশ করিয়া' ; তার অর্থ 'করেছি প্রবেশ' কি করে হয় ? 'গঅণত'='গগন হইতে' কিন্তু মণীন্দ্রবাবু লিখলেন 'গগনে সমুদ্রে' ? 'আমার দ্বারা গগন হইতে পানি আহার করা হয়েছে' অর্থই সুসংগত নয় কি ?

(৩৬) মূ— 'সঅল সুফল করি'— আমার সংশোধিত পাঠ 'সঅল মুকল করি', কারণ তিব্বতী অনুবাদে 'সকলং মুক্তীকৃত্য'। সংস্কৃত টীকায় 'জ্ঞানেন…সকলং ত্রৈলোক্যং পরিশোধ্য'। মণীন্দ্রবাবু 'সুফল'ই রেখেছেন। অর্থ করেছেন— 'সুফল করি' কিন্তু ত্রৈলোক্যের বিশুদ্ধীকরণ আর সুফল করা এক কথা নহে। পদের অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে মূলে ছিল 'ঘোরিঅ অবণাগমন'। আমি সংশোধন করি 'ঘোলিঅ—' তিব্বতীতে 'মিশ্রীকৃত্য', 'ঘোলিঅ' শব্দের এ-প্রয়োগ চর্যা ও দোহার নানা স্থানেই পাওয়া যায়। মণীন্দ্রবাবু ঘোরিঅ পাঠই রেখেছেন, অর্থ করেছেন 'গমনাগমন ঘানি…'। নিজের টীকায় লিখেছেন 'ঘোরিঅ — ঘানিকেতি'। কিন্তু সংস্কৃত টীকায় ওই অর্থে ঘানিকা ব্যবহৃত হয় নি। এই পদের শেষ পঙ্‌ক্তিতে মূলে 'পাখি' আছে, আমিও সেই পাঠ রেখেছি, কারণ অর্থ হচ্ছে 'সন্নিধানং' — 'নিকটে'। আমি অনুমান করেছিলাম 'পাখি' < 'পক্ষ' হিসাবে গ্রহণ করা চলে। মণীন্দ্রবাবু সংশোধন করেছেন 'পাশি' < পার্শ্ব। এ-সংশোধনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ মূল পুঁথির পাঠই যথেষ্ট অর্থদ্যোতক।

(৩৭) মূ— অছিলে স, প্রঃ— ইছিলেসি ; তিব্বতী অনুবাদে 'যেমন ইচ্ছা কর'। সংস্কৃত টীকায়— 'নিঃশঙ্কং সিংহরূপেণ ভ্রম'। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন— 'অছিলেসি' —'যেমন ছিলে' ; এর কোনো সমর্থন আছে কি ?

(৩৮) মূ— 'মেলি মেল সহজে'— প্রঃ— 'মেলি মেলি সহজে'— কারণ তিব্বতীতে 'মিলিত্বা মিলিত্বা' — মণীন্দ্রবাবু মূল পাঠ রেখেছেন কিন্তু অনুবাদ করেছেন— 'সহজ পথেতে চল'। কিন্তু শব্দসূচীতে 'মেলি' শব্দের অর্থ দিয়েছেন— মেল ধাতু+ই (ক্ত্বাচ্ হইতে)। মেল ধাতুর অর্থ পূর্বপদে দিয়েছেন— 'পরিত্যাগ করা'। এ-অর্থ কোথা হতে এসেছে বোঝা কঠিন।

তিনি এ ছাড়া আরও দশ-বারোটি মৌলিক পাঠ নির্ধারণ করেছেন। সেগুলির আর বিশদ আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। পূর্বের পাঠালোচনা হতেই বেশ বোঝা যাবে যে পাঠনির্ধারণে মণীন্দ্রবাবু কোনো একটা সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ করেন নি। যে-সমস্ত পাঠ তাঁর প্রদত্ত মৌলিক পাঠ হিসাবে গৃহীত হতে পারত সেগুলি ব্যাকরণ, অর্থসংগতি, সংস্কৃত টীকা, বা তিব্বতী অনুবাদ কোনোটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। পূর্ববর্তী আলোচনা-গুলি যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে বিচার করে কার্যে অগ্রসর হতেন তাহলে তাঁর এই পরিশ্রম

সার্থক হ'ত, আমরাও চর্যাপদের একটি প্রামাণিক সংস্করণ না পেলেও অন্তত তার দিকে অনেকটা অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু যে-রূপে তাঁর এই সংস্করণ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই সুযোগ্য নয়। সেই কারণে সে-সংস্করণ কোনো প্রামাণিকতার দাবি করতে পারে না।

চর্যাপদসংগ্রহ গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে এখনো কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছে এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে এ-নামকরণ ঠিক নয়, কারণ 'চর্য্যাচর্য্য' কথার কোনো সুসংগত অর্থ পাওয়া যায় না। তিনি অনুমান করেন যে গ্রন্থের সঠিক নাম ছিল 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়'। এ-নাম তিনি পেয়েছেন প্রথম চর্যাপদের টীকা হতে — 'শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে'। তাঁর প্রদত্ত নামের সমর্থনে বলা চলে যে তিব্বতী অনুবাদেও এই অংশটি অনূদিত হয়েছে— 'the most wonderful Carya songs'। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ও নির্বিচারে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' নামই সঠিক বলে গ্রহণ করেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে পুঁথির উপর 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম কোথা থেকে এল? নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত নয়। আমার মনে হয়েছিল যে মূলে এই নামটি ছিল 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'— লিপিকরপ্রমাদে ওই নামটি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' রূপ নিয়েছে। এই সংশোধনেও সংস্কৃত টীকায় উল্লিখিত নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষ করা চলে। ছন্দের খাতিরে 'চর্য্যাশ্চর্য্য' টীকার শ্লোকে 'আশ্চর্য্যচর্য্যা' হয়েছে। তা ছাড়া টীকার ওই শ্লোকে মূল নামটি যে পুরাপুরি উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে করবারও বিশেষ কারণ নেই। বিশেষত মঙ্গলাচরণের শ্লোকে তা করাই হয় না। এই কারণে বলেছিলাম যে গ্রন্থের 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' নাম করাই বিধেয়।

মণীন্দ্রবাবু তাঁর ভূমিকায় মূল পুঁথির উপরে লিখিত নামের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'চর্য্য অর্থে আচরণীয় এবং অচর্য্য অর্থে অনাচরণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিষয়ের নির্দেশ যে-গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। মণীন্দ্রবাবুর এই অর্থ যে সুসংগত হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। সুতরাং শাস্ত্রীমহাশয় প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের যে-নাম দিয়েছিলেন অর্থাৎ 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'— সে-নাম সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য ও নির্ভুল বলেই মনে হয়। কিন্তু গ্রন্থের এ-নাম যে সাধারণে প্রচলিত ছিল এ-কথা মনে করা যায় না। চর্যাপদের এই সংগ্রহ ও সংস্কৃত টীকার রচয়িতা মুনিদত্ত যে-নাম দিয়েছিলেন সে-নাম হচ্ছে চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি'। সুতরাং চর্যাসংগ্রহের নাম ছিল 'চর্য্যাগীতিকোষ' আর প্রত্যেক চর্যার নাম ছিল 'চর্য্যাগীতি।' এই চর্যাগুলি নানা রাগসংযোগে গান করা হ'ত, তার উল্লেখ গ্রন্থেই রয়েছে। সুতরাং 'চর্যাগীতি' নাম যে সুসংগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চর্যাপদের মূল পুঁথি ত্রুটিত বলে মাত্র সাতচল্লিশটি পদ পাওয়া যায়। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু তাঁর ভূমিকায় (পৃঃ ॥৵০-॥৶০) অকারাদিক্রমে যে-সিদ্ধদের নাম ও পদসংখ্যার সূচী দিয়েছেন তাতে পঞ্চাশটি পদই রয়েছে। এর কারণ তিনি আমার প্রবন্ধের সূচীটি নির্বিচারে উদ্‌ধৃত করে দিয়েছেন, আমার প্রবন্ধে পদগুলির তিব্বতী অনুবাদেরই সূচী দেওয়া হয়েছে, তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে পঞ্চাশটি পদই পাওয়া যায়। যে-তিনটি পদের মূল

পাওয়া যায় নি আমি সেগুলির তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়া দিয়েছি, তা থেকে পদগুলির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাবে।

পূর্বেই বলেছি যে সিদ্ধাচার্যদের দু'রকম রচনা পাওয়া যায়—অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষায় রচিত দোহা, এবং প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। তিব্বতী অনুবাদে সিদ্ধদেব রচিত আরও অনেক গীতিকা সংরক্ষিত রয়েছে। হয়তো অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গীতিকাও তাদের মধ্যে ছিল। দোহাগুলি যে কোনো দিন গান করে শোনানো হ'ত তা মনে হয় না। পদগুলি নানা রাগে গীত হ'ত। সে-সব রাগের নামও গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী কালের সাধকদের রচনাবলীর মধ্যে এই দুই প্রকারের রচনা পাওয়া যায়, কবীর-গ্রন্থাবলীতে যেমন রাগসংযুক্ত পদাবলী রয়েছে তেমনি সাখিসংগ্রহে প্রাচীন দোহার অনুরূপ বিবিধ বিষয়ে রচিত কাব্যও রয়েছে।

সিদ্ধদেব রচিত দোহার ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত সরল। যে সাম্প্রদায়িক মতবাদ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাও বোধগম্য। কিন্তু চর্যাগীতিগুলির পরিসর সীমাবদ্ধ বলে তাদের ভাষা ও ভাব অনেক স্থলেই অত্যন্ত দুরূহ। তারপর এগুলি লোকের কণ্ঠে-কণ্ঠে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়েই হয়তো সিদ্ধাচার্যেরা ইচ্ছা করে এগুলিকে হেঁয়ালিতে পরিণত করেছিলেন। কবীরের সাখিসংগ্রহ ও রাগযুক্ত পদের ভাষা ও ভাবের মধ্যেও ওই একই পার্থক্য লক্ষিত হয়।

যে-সব রাগে চর্যাগীতিগুলি গাওয়া হ'ত তার মধ্যে প্রচলিত এবং অধুনালুপ্ত রাগের নামও পাওয়া যায়। রাগগুলির নাম দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

অরু (৪); ইন্দ্রতাল (২৪); কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২); গবড়া, গউড়া (২, ৩, ১৮); গুর্জরী, কাহ্নুগুর্জরী, গুঞ্জরী (৫, ২২, ৪১, ৪৭); দেবক্রী (৮); দেশাখ (১০, ৩২); ধনসী, ধানশ্রী (১৪); পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮); মল্লারী (৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯); মালসী, মালশ্রী (৩৯); রামক্রী—রামকেলি (১৫, ৫০); বঙ্গাল (৪৩); বরাডী, বলাড্ডি (২১, ২৩, ২৮, ৩৪); শবরী (২৬, ৪৬)। রাগের উল্লেখ থেকে পটমঞ্জরীই যে তখন খুব জনপ্রিয় রাগ ছিল তা অনুমান করা চলে। তবে এ-সব রাগের কাঠামো কী ছিল তা বলা শক্ত। সঙ্গীতরত্নাকর প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ। সেজন্য মনে করা যেতে পারে যে রত্নাকরের পদ্ধতি অনুযায়ীই এ-রাগগুলি গাওয়া হ'ত।

মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দু-লাইনের শেষে 'ধ্রু' কথাটিরও উল্লেখ আছে। 'ধ্রু' কথাটির তাৎপর্য মণীন্দ্রবাবু বা ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কেউই আলোচনা করেন নি। অথচ পদরচয়িতার কাছে এ-কথাটির মূল্য যে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'ধ্রু' যে ধ্রুবপদের সংকেত তা সংস্কৃত টীকা হতে বোঝা যায়। ২, ৩, ৫ প্রভৃতি সংখ্যক পদের টীকায় 'ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন্' 'ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দমুদ্দীপয়ন্নাহ' ইত্যাদি উক্তিতে ধ্রুবপদের উল্লেখ রয়েছে। গীতিকার মধ্যে কোন্ পদটি ধ্রুবপদ ছিল তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় গীতিকায় ও তৃতীয় গীতিকায় দ্বিতীয় পদকে ধ্রুবপদ বলা হয়েছে মনে হয়। কারণ টীকায় দ্বিতীয় পদের অর্থনির্দেশের প্রারম্ভের ধ্রুবপদের উল্লেখ করা হয়েছে।—(২) ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বান্নাহ অঙ্গনমিতি [দ্বিতীয় পদটি হচ্ছে—অঙ্গন ঘরপণ

ইত্যাদি] (৩) ধ্রুবপদেন পরমার্থ বোধিচিত্তং দৃঢ়ীকুর্ব্বান্নাহ—সহজেতি [দ্বিতীয় পদটি সহজে থির করি ইত্যাদি] কিন্তু সংস্কৃত টীকায় এই ধ্রুবপদকে দ্বিতীয় পদ বলা হয় নি। তৃতীয় পদকেই দ্বিতীয় পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ধ্রুবপদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গীতিকায় পদসংখ্যা যা খুশি হতে পারে, ৫, ৬, ইত্যাদি কিন্তু প্রথম পদের পর যে-পদ উল্লেখ করা হয়েছে তার স্থান 'ধ্রুব' বা নির্দিষ্ট। সংস্কৃত টীকার তিব্বতী অনুবাদেও এই পদকে ধ্রুবপদ বলা হয়েছে dhu'i rkaṅ pa, অর্থাৎ 'ধু পদ'। ধু শব্দ ধ্রুব শব্দেরই প্রাচীন বাংলা রূপ, এর থেকেই পরে 'ধূয়া' শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

প্রত্যেক পদের শেষেই 'ধু' কথার উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে প্রত্যেক পদ গাইবার পর ধ্রুবপদটি গাইতে হ'ত। এ-পদটি বর্তমানে প্রচলিত সংগীতের 'স্থায়ী'র স্থান অধিকার করত। প্রাচীন সংগীতপদ্ধতিতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা অর্থাৎ গীতের প্রথম পদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পদ 'স্থায়ী' হিসাবে গৃহীত হ'ত কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত।

চর্যাগীতিকায় ধ্রুবপদের আর-একটি প্রয়োজনও দেখা যায়। ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এই পদটিতেই চর্যায় উল্লিখিত সাধনপথের সূত্রটি দেওয়া হয়েছে এবং সাধককে তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণে এ-কথা স্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় গীতিকার ধ্রুবপদ— অঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরী নিল অধরাতী ॥

তৃতীয় গীতিকার ধ্রুবপদ— সহজে থির করি বারুণী সান্ধে
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় চাঝে। ইত্যাদি

গীতিকাগুলির পরবর্তী পদগুলিতে এই সূত্র অনুসরণ করেই সাধনপন্থার ব্যাখ্যা কর. হয়েছে। সেই কারণে এই ধ্রুবপদের বার-বার উল্লেখে শ্রোতার মনে কোনো বিরক্তির উন্মেষ হ'ত না। বরং মূল সূত্রের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি উত্তরোত্তর বেশি আকৃষ্ট হ'ত। উত্তর ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে স্থায়ীর কাজও দুই প্রকার। প্রথমত স্থায়ী বার-বার উল্লেখে রাগের প্রধান স্বরসন্নিবেশে শ্রোতা পুনঃপুনঃ রাগের সূত্রের সন্ধান পান, দ্বিতীয়ত গানের প্রথম কথাগুলি বার-বার ফিরে আসবার দরুন শ্রোতা মানসপটে ছবি এঁকে নিতে পারেন, বাকি কথা না বুঝলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। চর্যাগীতিকার ধ্রুবপদেরও এই প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই মনে হয়।

দিব্য-স্মৃতি

আমরা যে অসাধারণ পুরুষের স্মৃতি উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হয়েছি তাঁর নাম দিব্য। ঐতিহাসিকেরা সে-নাম অতি অল্পদিন পূর্বেই প্রাচীন পুঁথিপত্র তাম্রপট্ট ও শিলালিপি হতে উদ্ধার করেছেন। দিব্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তার কারণ এ-দেশের প্রাচীন ইতিহাসে অসাধারণ পুরুষ বা মহাজনের নাম বিরল। যে-সব মহানুভব ব্যক্তির নাম শুনলে লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়, যাঁদের কীর্তি-কাহিনী শুনলে হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, দেশহিতকল্পে যাঁদের স্বার্থত্যাগের কথায় জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয় সেইসব ব্যক্তিই মহাজনপদবাচ্য। দেশবাসীর অনেক পুণ্যফলে তাঁদের জন্ম হয়। ভারতবর্ষে এরূপ মহাজন অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যাঁদের নাম উপাখ্যান ও ধর্মকাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের আর আমরা মানুষ হিসাবে পাই না। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি মহাপুরুষ মানুষ-লোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁদের সমস্ত জীবন ছিল লোকোত্তর। তাঁরা ছিলেন মানুষরূপী দেবতা। তাই তাঁরা যুদ্ধজয় করেন বটে কিন্তু ব্যবহার করেন দৈবীশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র, তাঁরা জয়মাল্য পরেন বটে কিন্তু সে-মাল্য হচ্ছে পারিজাতের। তাঁরা ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের সে-মহান্ ত্যাগ আমাদের কল্পনাশক্তিকেও ব্যাহত করে। সেইজন্য তাঁদের সঙ্গে আমরা আর আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি না। নগরচত্বরে আর তাঁদের মূর্তির স্থাপনা করতে আমাদের সাহস হয় না। তাদের মূর্তি তখন স্থাপিত হয় মন্দিরে আর আমরা সে-মূর্তির পূজা করি পারলৌকিক গতির উৎকর্ষের জন্য। তাঁদের আদর্শ জীবনে প্রতিপালন করবার চেষ্টা তখন হয় দুরাশা মাত্র। সেই কারণে দেবতার সংখ্যা আমাদের ইতিহাসে যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পায় অসাধারণ পুরুষের সংখ্যা সে-পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না।

দিব্য যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন তাতে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ৺অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ দিব্যের ইতিহাস আলোচনা করে যে-সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমরা চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি। আমি সে-ইতিবৃত্তের শুধু সারাংশের উল্লেখ করব। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল বা দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েই তিনি অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং কপটাচারী লোকের মন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের দুই ভাই রামপাল ও সুরপালকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে রামপাল তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করবার সংকল্প করেছিলেন। মহীপালের অত্যাচারের জন্য বরেন্দ্রমণ্ডলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এ-বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক। মহাবীর দিব্য শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় না হলেও বরেন্দ্রীর মিলিত সামন্তচক্র তাঁকে সহায়তা করেছিল। দিব্য বরেন্দ্রী রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী অর্থাৎ রাজপুরুষ কিংবা সামন্তরাজ

ছিলেন। মহীপাল দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ও বরেন্দ্রী দিব্যের হস্তগত হয়। কিন্তু তিনি নিজে সে-রাজ্য আত্মসাৎ না করে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে রামপাল মুক্তিলাভ করে গঙ্গার অপর পারে মাতুল-বংশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীম যে উপযুক্ত রাজ্যশাসক ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন ক্রিয়াক্ষম এবং রন্ধ্রপ্রহারী। রামচরিতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন রক্ষণীয়দের রক্ষক। তাঁর পক্ষভুক্ত রাজন্যগণ তাঁর আশ্রয় লাভ করে জয়শীল শত্রুর হস্ত হতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি ছিলেন যুদ্ধে অজেয় এবং তাঁর রাজ্যকালে বরেন্দ্রীমণ্ডল অতিশয় সম্পদ, সজ্জনগণ অযাচিত দান এবং পৃথিবী কল্যাণ লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিতে কল্পতরু ও পরোপকারী এবং সমস্ত জগৎকে জীবনীশক্তি দান করেছিলেন। উপরন্তু—

যোঽত্যন্ততোয়শোভী রাজিত দিগ্‌ভিত্তিরহতমর্য্যাদঃ।
সুকৃত পদব্যালোভেন কৃতোৎসাহোবহন্মহাশয়তাং ॥

'তিনি বিপুল যশদ্বারা দিগ্‌ভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন, কখন তাঁর মর্যাদার হানি হয় নাই। তিনি লোভে আকৃষ্ট হইয়া কোন কর্মে উৎসাহ প্রদান করিতেন না, ধর্মবর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন।'

দিব্যের জীবদ্দশায় রামপাল পিতৃভূমি উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন নি। খুবসম্ভব তাঁর মৃত্যুর পর মাতুলগোষ্ঠীর সহায়তায় পিতৃরাজ্য উদ্ধারে যত্নবান হন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সেনাপতি শিবরাজ এ-কার্যে সহায়তা করেন। শিবরাজের একার পক্ষে ভীমকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। তিনি যে সামন্তচক্রের সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের নাম রামচরিতে দেওয়া আছে। রামচরিতকার স্পষ্টই বলেছেন যে কোটাটবী, দণ্ডভুক্তি, দেবগ্রাম, অপারমন্দার, কুজবটী, তৈলকম্প উচ্ছাল, ঢেক্করীয়, কয়ঙ্গল, কাঁকজোল, সংকটগ্রাম, নিদ্রাবলী, কৌশাম্বী ও পদুবন্বার সামন্তরাজগণের সমবেত চেষ্টায় ভীমকে উৎখাত করা হয়। এই সামন্ত রাজাদের মধ্যে কেউই বরেন্দ্রমণ্ডলের লোক ছিলেন না। ভীম প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু বরেন্দ্রের সামন্তরাজগণ আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

দিব্য ও ভীমের এ-বৃত্ত উল্লিখিত হয়েছে রামচরিতে। রামপালের পরবর্তী পালরাজাদের তাম্রপট্টে দিব্য ও ক্ষৌণীনায়ক ভীমের বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়েছে রামচরিতে। রামচরিতের রচয়িতা হচ্ছেন সন্ধ্যাকরনন্দী। তিনি ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নন্দবংশীয় পিণাকনন্দীর পৌত্র এবং পাল-বংশীয় মদন-পালদেবের সান্ধিবিগ্রহী। সুতরাং এ-গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপাল ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দিব্য ও ভীম সম্বন্ধে যে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আংশিক সত্য মাত্র। তাতে দ্বিতীয় মহীপালের কুকীর্তি এবং দিব্য ও ভীমের গুণাবলীর কথা অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ গ্রন্থকার ছিলেন পাল-রাজাদের বিত্তভোগী। এ-সত্ত্বেও যখন সে-গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপালকে স্পষ্ট করেই রামপালের 'দুর্ণয়ভাক্‌' এবং 'অনীতিকারী অগ্রজন্মন্‌' বলা হয় তখন তাঁর চরিত্র বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। উপরন্তু ওই গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে মহীপাল মায়ী বা খলস্বভাব লোকের মন্ত্রণায় চালিত হতেন এবং তাঁর ব্যসনের জন্যই বরেন্দ্রভূমি পাল-রাজাদের হস্তচ্যুত হয়। এই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধেই দিব্যের বিদ্রোহ। দিব্য ও

ভীমের গুণাবলী সন্ধ্যাকরনন্দী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এই বিদ্রোহে সমস্ত বরেন্দ্রভূমির প্রজা ও সামন্তচক্রের সহানুভূতি না থাকলে তা দমন করতে রামপালের সমস্ত মগধ ও বঙ্গের সামরিকশক্তির সমাবেশ করতে হ'ত না। সুতরাং এ-কথা আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে বরেন্দ্রভূমির অধিবাসীগণ দেশের কল্যাণের জন্য একদিন অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে ভয় পায় নি। সে-সময়ে তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ রাজা দিব্য।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে বরেন্দ্রভূমি দিব্যের হস্তগত হয় বটে কিন্তু তিনি তা আত্মসাৎ না করে কার্যকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের রক্ষাধীন করেন। এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে আমাকে রামচরিতের একটি শ্লোকের অর্থ আলোচনা করতে হবে। সে-শ্লোকটি হচ্ছে এই—

ত্রস্তানুজতনুজস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহরকৃতঃ।
সাভিখ্যায়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলুরক্ষণীয়াভূৎ ॥

মহীপালের অত্যাচারে ত্রস্তা বরেন্দ্রী নামক প্রদেশ তাঁর অর্থাৎ দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রন্ধ্র-প্রহারী ও ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া হয়েছিল।

আমরা অনেকেই জানি যে রামচরিতের শ্লোকগুলির দুইটি অর্থ আছে। একদিকে রামায়ণের ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে পাল-বংশের ইতিবৃত্ত বা রামপাল-চরিতের ঘটনাবলী সূচিত হয়েছে। সুতরাং এ-কাব্যের অর্থ টীকার সাহায্য বিনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রামচরিতের টীকাও হয় সন্ধ্যাকরনন্দীর নিজের রচিত, না-হয় তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কেউ রচনা করেছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকের টীকার সারমর্ম হচ্ছে এই—যেমন রাবণ জটায়ুর আক্রমণ সত্ত্বেও ত্রস্তা সীতাকে অপহরণ করে উপভোগ করবার শক্তি থাকলেও তাঁকে উপভোগ না করে রক্ষণীয়া করে রাখলেন, ঠিক তেমনি (যথোক্তক্রমণ দিব্য ভীতা বরেন্দ্রীকে গ্রহণ করে উপভোগ করবার ক্ষমতা থাকলেও তা না করে রন্ধ্রপ্রহারী ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া করলেন।

দিব্যের এ মহৎ ত্যাগ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি বরেন্দ্রভূমির সংরক্ষণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এতে তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

পাল-রাজারা ছিলেন ভিন্নদেশী এবং অজ্ঞাতকুলশীল। তাঁরা বংশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বলেই নিজেদের সমুদ্রকুলোদ্ভূত বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই বিদেশী আভিজাত্যহীন রাজাদের যে বরেন্দ্রমণ্ডলে কী প্রতিষ্ঠা ছিল তা আমরা জানি না। প্রাচীন-কালে ভারতের কোনো প্রদেশেই বৈদেশিক রাজার প্রভাব স্থায়ী হয় নি। যতদিন তাদের সামরিক শক্তি অটুট থাকত ততদিন তাঁদের আধিপত্যও অক্ষুণ্ণ থাকত। তাঁদের মধ্যে যদি কেউ দেশের কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করে দেশবাসীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হতেন তখন তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং তাঁর বংশের মর্যাদাও বেড়ে যেত। এ-দুয়ের অভাব হলেই সে-রাজবংশের নাম বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হ'ত। সেই কারণেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বরেন্দ্রমণ্ডলেও জনসাধারণ বৈদেশিক রাজাকে উপেক্ষা করেই চলত। যে-সব সামন্ত মণ্ডলীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল নিকট, তাঁদেরই তারা সত্যকার রাজা বলে মেনে নিত। কারণ দেশের জল বায়ু ও মাটির সঙ্গে যাদের যোগসূত্র

গাঢ়বদ্ধ তাদের মধ্যেই সহানুভূতি জন্মে। তাই বরেন্দ্রভূমি নিপীড়িত হলে দিব্যোর চিত্ত সে-দেশের জনসাধারণের জন্য যতটা ব্যথিত হ'ত পাল-বংশীয় কিংবা অন্য বৈদেশিক রাজার তা হ'ত না।

এ-কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে বরেন্দ্রীমণ্ডলের স্থান অতি উচ্চে। বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির আরম্ভ এই বরেন্দ্রীমণ্ডলে। বরেন্দ্রী-মণ্ডলের প্রাচীন রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধননগর। সম্প্রতি মহাস্থানে যে মৌর্য-বংশীয় রাজা অশোকের প্রায় সমসাময়িক ব্রাহ্মী-লিপিতে লিখিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রনগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এর চাইতে প্রাচীন সাহিত্যেও পুণ্ড্রবর্ধন নগরের উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধবচন পরে লিপিবদ্ধ হ'লেও অশোকের পূর্ববর্তী। আর, এরূপ একটি বুদ্ধবচনে আর্যাবর্তের সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে। কাউকে প্রথম বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে হ'লে বহু বিনয়ধর বা সদাচারী ভিক্ষুর প্রয়োজন হ'ত। অথচ বৌদ্ধধর্মের ধারা প্রসার লাভ করে এমন অনেক দেশে এসে পৌঁছেছিল যেখানে প্রথম-প্রথম পাঁচজনের বেশি সদাচারী ভিক্ষু পাওয়া যেত না। এই অসুবিধার জন্য বুদ্ধের প্রধান শিষ্য উপালী তাঁকে সে-সব দেশে উপসম্পদার জন্য নূতন নিয়ম প্রবর্তন করতে বলেন। বুদ্ধদেব তখন অনুমতি দিলেন যে প্রত্যন্ত দেশে বা আর্যাবর্তের বাইরে পাঁচজন ভিক্ষুই উপসম্পদা দিতে পারবে। উপালী প্রত্যন্ত দেশের আরম্ভ কোথায় জানতে চাইলে বুদ্ধদেব আর্যাবর্তের যে পূর্ব সীমানা নির্দেশ করেন তা হচ্ছে পুণ্ড্রবর্ধন নগর—

'যদুক্তং ভদন্ত ভগবতা প্রত্যন্তিমেষু জনপদেষু বিনয়ধরপঞ্চমেনোপসংপদং।
তত্র কতমোন্তঃ কতমঃ প্রত্যন্তঃ। পূর্বেণোপালি পুণ্ড্রবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য
পূর্বেণ পুণ্ড্রকক্ষো নাম পর্বতঃ ততঃ পরেণ অত্যন্তঃ।'

অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন নগরের পূর্বে পুণ্ড্রকক্ষো নামক পর্বত ছিল প্রাচীনকালে আর্যাবর্তের পূর্ব সীমা। তারপর প্রত্যন্ত দেশের আরম্ভ। এই পুণ্ড্রকক্ষো পর্বত কোথায় তা হয়তো প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একদিন বের করবেন। কিন্তু বুদ্ধের এ-বচন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অশোকের পূর্বেও আর্যাবর্তের অন্যান্য স্থানের মতো পুণ্ড্রনগরে সদাচারসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বিরল ছিল না। বরেন্দ্রমণ্ডল গুপ্ত ও পাল-বংশীয় রাজাদের সময় যে-সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তার ইতিহাস অনেকেই অঙ্কিত করেছেন। বাংলাদেশে সবচাইতে প্রাচীন নগর নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও এই বরেন্দ্রীমণ্ডলেই পাওয়া গিয়েছে। এ-যুগের সবচাইতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে জগদ্দল, সোমপুরী প্রীতি প্রভৃতিও এই বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন নগরের অনতিদূরে অবস্থিত বাসব-সংঘারামে একসঙ্গে সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান ও শিক্ষালাভ করত। এ-দেশের শিল্পীদের নাম নেপাল, তিব্বত এবং তিব্বত হতে চীন পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সংস্কৃত স হিত্যের একটা বিশেষ রচনাশৈলী অর্থাৎ গৌড়ী রীতি, এবং প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের গৌড়ী বাঙ্গালী প্রভৃতি সুরের সৃষ্টিও এই উত্তরবঙ্গে।

পাল, সেন ও তৎকালীন অন্যান্য রাজা বা রাজপুরুষদের যে-সব শিলালিপি ও তাম্রপট্ট প্রকাশিত হয়েছে তা হতেও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এ-প্রদেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে সে-সময় বেদালোচনা, বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রিয়াপদ্ধতি

বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগে যে-সব নূতন তন্ত্রমতের প্রচলন হয়েছিল, এবং যার প্রভাব এই প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে এখনো বর্তমান রয়েছে তার সৃষ্টিও যে বহু পরিমাণে এই দেশেই হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সুতরাং পাল-রাজাদের হস্তগত হবার পূর্বে অন্তত হাজার বছর ধরে বরেন্দ্রমণ্ডলীর অধিবাসিগণ ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এবং তা একটা নূতন ধারার প্রবর্তন করেছিল। সেই ধারাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রকৃত ধারা। যে-প্রদেশ এই নূতন সংস্কৃতির সংগঠনে সহায়তা করেছিল তার অধিবাসিগণ যে উন্নতির অতিউচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণে পাল-বংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই সে-দেশের অভিজাত ব্রাহ্মণ ও সামন্তবর্গকে সমীহ করে চলতেন।

এ-কথা যে অনুমান মাত্র তা নয়; সমসাময়িক শিলালিপি হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপালদেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি ছিলেন বরেন্দ্রমণ্ডলের অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান। তাঁর সম্বন্ধে শিলালিপিতে যে-উক্তি আছে তা হচ্ছে এই—

মাদ্যন্নানাগজেন্দ্র-স্রবদনবরতোদ্দাম-দান-প্রবাহো-
ন্মৃষ্টক্ষোণী-বিসর্পি-প্রবল-ঘনরজঃ-সম্ব তাশাবকাশং।
দিক্-চক্রাঘাত-ভূভৃৎ-পরিকর-বিসর-ব্বাহিনী-দুর্ব্বিলোক-
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালনৃপতিরবসবাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য॥

'নানা মদমত্ত মতঙ্গজ মদবারি নিষিক্ত ধরণিতলবিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমাণ সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত সেই দেবপাল [নামক] নরপাল দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।'

দত্বাপ্যনল্পমুডুপচ্ছবি পীঠমগ্রে।
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশুঃ।
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ॥

'সুররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি সেই দর্ভপাণিকে অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী মহার্হ আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।'

দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বরের গুণাবলীও শিলালিপিতে অনুরূপভাবেই কীর্তিত হয়েছে।

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা।
বিত্যান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদ্‌গর্ব্ব মাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহু প্রণয়িনঃ সম্বল্‌গিতাশ্চপ্রিয়া।
যেনৈবং স্বগুণৈ-র্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ॥

'তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত স্থানে আরোহণ করিয়াও ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না, তিনি অর্থিগণকে বিত্ত বর্ষণ করিবার সময়ে তাহাদের স্তুতিগীতি শ্রবণের জন্য উদ্‌গর্ব হইতেন না। তিনি ঐশ্বর্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে নৃত্যশীল করিতেন।

সুতরাং এই সকল জগদ্ বিসদৃশস্বগুণ গৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।'

সোমেশ্বর-পুত্র কেদার মিশ্রের প্রভাবও কোনো অংশে কম ছিল না। কারণ তাঁর সাহায্য ও বুদ্ধিবলেই দেবপালদেব উৎকল জয় করেছিলেন, হূনদের গর্ব খর্ব করেছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জর-রাজদের দর্প চূর্ণ করে পাল-সাম্রাজ্যের সীমাবিস্তার করেছিলেন। এই সোমেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আসন্নাজিহ্ম রাজদ্বহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্ চক্রবালো।
দুর্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষ-বিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ॥

'তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] আবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ পরিণত অশেষ বিদ্যা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল।'

স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যোনুমেনে।
দ্বিষদি সুহৃদি চাসীন্নির্বিবেকো সদাত্মা।
ভবজলধিনিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপ্রা চ।
পরিমৃদিতকষায়ো যঃ পরে ধাম্মি রেমে॥

'তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না। মনে করিতেন তাঁহার দ্বারা অপহৃতবিত্ত হইয়াই তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রুমিত্রে নির্বিবেক ছিল। [কেবল] ভবজলধিজলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। [তিনি সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয় বাসনা ক্ষালিত করিয়া পরমধাম চিন্তায় আনন্দ লাভ করিতেন।'

বরেন্দ্রভূমির এক ব্রাহ্মণ-বংশের সামান্য পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে পালবংশীয় রাজারা তাঁদের অবসরের অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং অতি সংকোচের সঙ্গেই তাঁদের সামনে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। সে-বংশের কীর্তিমান ব্যক্তিদের রুচি এত মার্জিত ছিল যে তাঁরা দুঃস্থকে সাহায্য করে স্তুতিবাদ শুনতে উদ্গ্রীব থাকতেন না। উপরন্তু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে এ-কথা অন্তরে অনুভব করতেন যে তাঁদের ন্যায় ধনশালী ব্যক্তিদের দ্বারা অপহৃতবিত্ত হয়েই তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই পরিচয় হতে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে বরেন্দ্রভূমিতে সভ্যতা কত উন্নত ছিল। সে-প্রদেশের অধিবাসীরা আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, তাদের রুচি ছিল অতি মার্জিত। আর এ-কথা পূর্বেই বলেছি যে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প প্রভৃতি ছিল অতি উন্নত। সুতরাং সে-জাতির মধ্যে যে সত্যকার দেশাত্মবোধ ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সে-দেশাত্মবোধ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই নিহিত ছিল, সেই কারণে কৈবর্তরাজ দিব্য কিংবা ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি কেউই বৈদেশিক পাল-রাজাদের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নি।

এ-কথা অনেকেই বলে থাকেন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে অখণ্ডবোধে দেশপ্রেম আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না। তা না থাকলেও ইতিহাসের ধারা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য যে পিতৃভূমির প্রতি আমাদের টান কোনোদিন অন্য কারু চাইতে কম ছিল না। কোনো দেশের সঙ্গে সে-দেশের অধিবাসীদের মনের যোগ অতি-

সূক্ষ্ম ও অচ্ছেদ্য ; সেই কারণেই এই বরেন্দ্রভূমির জনসাধারণের চিত্ত এ-প্রদেশের রক্ত-মৃত্তিকা, বিস্তৃত প্রান্তর, খরস্রোতা করতোয়া, তিস্তা বা ভাগিরথীর বিস্তৃত জলপ্রবাহ প্রভৃতি যে আনন্দরসে সিক্ত করত, তার ভাগভোগী অন্য কেউ হতে পারত না। সেই আনন্দই ছিল এ-প্রদেশের দেশপ্রেম, শিল্প, কলা, সাহিত্যে বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, সংগীতে বিশিষ্ট সুরসৃষ্টির প্রধান উৎস। সে-আনন্দে বরেন্দ্রমণ্ডলীর সকল অধিবাসীদের চিত্তই উদ্বেলিত হ'ত। এই কারণে সেই দেশমাতৃকাকে বিপন্ন দেখেই যে দিব্য ও অন্যান্য সামন্ত-রাজারা তার কল্যাণকল্পে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জনসাধারণের সহায়তা পেয়েছিলেন তাতে আব আশ্চর্যেব কী থাকতে পারে।

দিব্য জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য করেছিলেন তা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যায়। সুতরাং তাঁকে ক্ষত্রিয় বলতে আমাদেব কি আপত্তি থাকতে পারে ? এ-সম্বন্ধে ইতিপূর্বে রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর যে-সারগর্ভ কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ·

'পুবাকালের কোনও মহাপুরুষের জাতিবিচারের সময় আমাদেব স্মরণ রাখা উচিত যে সেকালের জাতিভেদ এবং একালের জাতিভেদে বিস্তর প্রভেদ আছে। সেকালে, এমন কি ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারলাভেব পূর্বে, গ্রামসমূহ ছিল রাষ্ট্রেব সর্বস্ব, এবং প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ ছিল। সুতবাং বিভিন্ন জাতির গ্রামবাসীর মধ্যে গ্রাম্য স্বরাজপরিচালনেব উপযোগী একতাও ছিল। এই একতার বন্ধনসূত্র ছিল গ্রামসম্বন্ধ। গ্রামের সকল জাতির নরনারী পরস্পরকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ মনে করিতেন। গ্রামবাসী জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরস্পরকে ভাই, ভগিনী, কাকা, দাদা ইত্যাদি সম্বন্ধ ধরিয়া সম্বোধন করিতেন। সেকালের গ্রামসম্বন্ধের কিছু কিছু ভগ্নাংশ এখনও গ্রামে অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে গ্রাম্য স্বরাজ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং পাশ্চাত্ত্য ধরণে গঠিত শহর হইতে ধন, মান এবং শিক্ষাব অভিমান প্রবেশ করায় জাতিভেদ বিকৃত আকাব ধাবণ করিয়াছে। কিন্তু সেকালে ধন-মানেব গর্বেব বিষমিশ্রিত এই প্রকাব জাতিভেদেব অস্তিত্বই ছিল না। বাঙলাব রাজা প্রজা তখন বোধহয় জাতি লইয়া বড় মাথা ঘামাইতেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য বাজবংশেব প্রশস্তির আরম্ভে চন্দ্রকে বা সূর্যকে বা চন্দ্রসূর্যবংশীয় কোনো ক্ষত্রিয় রাজাকে আদিপুরুষরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ধর্মবংশীয় নৃপতিগণের এবং সেন রাজগণের প্রশস্তিতে তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু পাল নরপালগণের এবং বিক্রমপুরের পূর্ণচন্দ্রাদি চন্দ্রনরপালগণের বংশ প্রশস্তিতে চন্দ্রেব বা সূর্যেব উল্লেখ নাই। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে পালরাজগণ সমুদ্রবংশীয়। সমুদ্র চন্দ্রেব উৎপত্তিস্থান। সুতরাং সমুদ্রবংশকে চন্দ্রবংশরূপে গ্রহণ কবা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহপালকে মিহিব (সূর্য) বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। পালরাজ্যের ইতিহাসের শেষভাগে প্রায় একই সময়ে এই দুইটি বিরোধী মতেব প্রচার দেখিয়া মনে হয় পালরাজগণ এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তবে কি তখন জাতিভেদ ছিল না ? প্রাচীন তন্ত্রের গ্রাম্যস্বরাজের দায়মুক্ত, গ্রামের সম্বন্ধবন্ধনবিচ্যুত ধনমান গর্বপুষ্ট জাতিভেদ তখন ছিল না এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।...মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্বাচিত দিব্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন।...

'এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রধান

পরিবর্তন, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি যে পল্লীসমাজ যাহা মুসলমানগণকেও আপনার করিয়া ভাই, চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল তাহা প্রাণ হারাইয়াছে এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।'

চন্দমহাশয়ের এ-কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তার সাক্ষ্য আমরা সকলেই কিছু-কিঞ্চিৎ দিতে পারি। জাতি-বিভাগ হয়তো ছিল, কিন্তু যে-ভেদবুদ্ধি সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে দেশের প্রভূত অশুভ সংঘটন করে সে-ভেদবুদ্ধি যে এ-দেশে ছিল না তার প্রমাণ পুঁথিপত্রেও পাওয়া যায়।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিভেদ সমার্থবাচক। দেবপালদেবের পিতা ধর্মপাল সম্বন্ধে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি স্বধর্ম হতে বিচলিত বিভিন্ন বর্ণকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাপনা করেছিলেন (চলতোঽনুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে)। তৃতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন চাতুর্বর্ণ্যসমাশ্রয় অর্থাৎ চারিবর্ণের আশ্রয় স্থান। কিন্তু এ-সব উক্তি নিরর্থক। প্রাচীন শাস্ত্রবচনের কদর্থ করেই পরবর্তী টীকাকারেরা সমাজকে এই চার ভাগে ভাগ করেছেন, সমাজের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ ছিল না এবং এখনো নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত হয়েছে যে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি। পরবর্তী শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই চারটি বর্ণের প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট রং আছে, ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্বেত, ক্ষত্রিয় রক্ত, বৈশ্য পীত এবং শূদ্র কৃষ্ণ। বস্তুত বর্ণাশ্রমের বর্ণ-শব্দও সেই অর্থেরই সূচনা করছে। বেদ ও শাস্ত্রের এ-উক্তিকে ব্যবহারিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ কোনো যুগে ভারতীয় জাতির মধ্যে এই চার রঙের লোক ছিল এ-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আর সে-ব্যবহারিক অর্থ যদি গ্রহণ করতে না পারি তবে সে-উক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের জাতিভেদের ইতিবৃত্ত অঙ্কন করবার চেষ্টা বৃথা। মন্ত্রপাঠ ও অধ্যাপনার জন্য মুখের প্রয়োজন, বাহু শারীরিক বলের দ্যোতনা করে, উরু সংবর্ধনের প্রতীক এবং পাদদ্বয় দেহীর আজ্ঞাবাহী। সুতরাং মুখের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়েছে তাদের কর্ম অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, বাহুর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্ম হচ্ছে বাহুবলের দ্বারা দেশ সংরক্ষণ, উরুর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্ম হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং পাদদেশের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্তব্য কর্ম হচ্ছে সেবা। এদের যে-রঙের কথা বলা হয় সে-রং সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণ হতে উদ্ভূত হয়েছে এ অনুমান করা অসংগত নয়। সুতরাং শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম ছিল আদর্শমাত্র। সত্যকার জাতিভেদের ইতিহাস তার মধ্যে নিহিত ছিল এ-কথা মনে করা অনুচিত। শাস্ত্র-বচনের যদি সদর্থ গ্রহণ করি তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে দিব্য ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয়, আর সে-আদর্শের অনুযায়ী যিনি দেশ ও দেশবাসীর সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করবেন তিনিও হবেন প্রকৃত ক্ষত্রিয়পদবাচ্য।

দিব্য ছিলেন বরেন্দ্রীর সন্তান। কিন্তু তাঁর ইতিবৃত্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র হতে যতটুকু উদ্ধার করা হয়েছে সেইটুকুই আমাদের সম্বল। অথচ এই প্রদেশের এমন অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যার সঙ্গে দিব্য ও ভীমের নাম বিশেষভাবে জড়িত। এ-দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী হতেও সে-নাম সংগ্রহ করা যায়। এ-দেশের সত্যকার ইতিহাস এখনও বরেন্দ্রীমণ্ডলের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুক্কায়িত। পাহাড়পুরের একটি সামান্য ধ্বংসস্তূপ

হতে যে-তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা বাংলাদেশের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে অনেক অগ্রসর করে দিয়েছে। আমরা যদি বিশেষ অবধানতার সঙ্গে এইসব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে পারি এবং অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য কিংবদন্তী সযত্নে সংগ্রহ করতে পারি তাহলে দিব্য ভীম ও তাঁদের সমসাময়িক সমগ্র বরেন্দ্রীভূমির প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করতে সমর্থ হবো। তাতে যে শুধু বরেন্দ্রীভূমিই উপকৃত হবে তা নয়, সমগ্র বাংলা দেশই লাভবান হবে। ধ্বংসস্তূপ হতে ইতিহাসের ধারার উদ্ধারসাধনে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অতি সামান্য কাজই করেছেন।… কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণকে যদি আমরা এইসব ধ্বংসস্তূপের সত্যকার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারি এবং এ-কাজে যদি তাদের সকলের সহায়তা লাভ না করতে পারি, তাহলে বরেন্দ্রীর সেই কীর্তিমান পুরুষ দিব্য এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ইতিহাস সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্ধার করা কোনোদিনই সহজসাধ্য হবে না, উপরন্তু সমস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের উদ্ধারকার্য হবে বিশেষ কষ্টসাধ্য। সুতরাং যাঁদের নিকট দিব্যোর নাম প্রিয়, সে-নাম যাঁদের মনে এখনো উৎসাহের সঞ্চার করে এবং সে-মহাপুরুষের আদর্শে যাঁরা এখনো অনুপ্রাণিত হন তাঁদের আমরা এ-সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হতে অনুরোধ করি।

আমরা আত্মবিস্মৃত বলেই আজ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়েছি। সত্যকার ইতিহাসের অভাবে আমরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়েছি। নিজেদের জাতীয় সভ্যতার উপর আমাদের আর কোনো শ্রদ্ধা নেই। প্রাচীন শিল্প কলা সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। উপরন্তু ভেদবুদ্ধি এ-ছত্রভঙ্গ জাতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই দুর্দিনে আমরা যদি আমাদের অতীতের উপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারি, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আনাদের মনের যোগসূত্র আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পারি তাহলে আমরা আবার সচেতন হয়ে উঠতে পারব। আমরা আবার একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব। এই কারণেই বরেন্দ্রীয় সেই অসাধারণ পুরুষ দিব্যোর কীর্তি-কাহিনী আজ বিশেষভাবে আমাদের স্মরণীয়। তাঁর চরিত-কথা অনুধাবন করলে আমরা আবার এ-দেশের জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনের যোগসূত্রের সন্ধান পাব।*

* ভীমেরগড়, বদরগঞ্জে (রংপুর) অনুষ্ঠিত দিব্য-স্মৃতি উৎসবের চতুর্থ অধিবেশনে (৬ চৈত্র ১৩৪৪) সভাপতির অভিভাষণ।

কবীরের সাধনা

ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে ভারতের ইতিহাসেও আমরা যুগনির্ধারণে ব্যস্ত। তাই প্রাচীন যুগের পর একটা মধ্যযুগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণত কোনো সন্দেহ ওঠে না। কিন্তু চিন্তাজগতের বৈশিষ্ট্য দিয়েই যদি নূতন যুগের উদ্বোধন হয় তাহলে বস্তুত ভারতের ইতিহাসে কোনো মধ্যযুগের সত্তা নেই। তার কারণ খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে ভারতে যে-সব সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাব হয় তাঁদের শিক্ষার ধারাই পরবর্তীকালে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভারতীয় চিন্তা বা সাধনার গতি কোনোকালেই প্রতিহত হয় নি, মুসলমান ধর্মের আবির্ভাবেও নয়।

খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বা সে-সময়ের কিছু পূর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যে-সব সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তার ভিতর নাথ ও সহজ বা অবধূত সম্প্রদায়কেই সবচেয়ে বড় স্থান দিতে হয়। নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা মৎসেন্দ্রনাথের হাতে, ও পুষ্টি হয় গোরখনাথ, রাজা ভর্তৃহরি, গোপীচন্দ্র প্রভৃতির হাতে। সহজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে তা সঠিক বলা যায় না, তবে এই সম্প্রদায়ের যে-সব সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের ভিতর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি— কৈবর্ত, তাঁতি, তিলি প্রভৃতিও ছিল। নাথ ও সহজ কোনো সম্প্রদায়ের ভিতরই জাতিবিচার ছিল না— যে-কোনো জাতীয় ব্যক্তিই নিজের প্রতিভাবলে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার অধিকার পেতে পারত। তাই বলে এমন কথা বলাও চলে না যে এইসব সাধকেরা বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ— প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধারা অনুকরণ করে বর্ণাশ্রমের বাইরে এক উদাসী যোগী সম্প্রদায় সৃষ্টি করাই ছিল তাদের কাম্য।

সে যাহোক অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষায় লেখা যে-সাহিত্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভাব খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এর পরই উত্তর ভারতে গুরু রামানন্দ ও তাঁর বারোজন শিষ্যের আবির্ভাব।

রামানন্দ ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। নানা গ্রন্থের কথা বিশ্বাস করতে হলে ধরতে হবে তিনি ১১১ বৎসর জীবিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথমেই তাঁর মৃত্যু হয়। কবীর সে-সময়ে বালক। রামানন্দের বারোজন শিষ্যের নাম— অনন্তানন্দ, সুরসুরানন্দ, পীপা, সুখানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, সেনা, ধন্না, রুইদাস, জীবানন্দ, রঘুনাথ ও পদ্মাবৎ। রামানন্দ প্রথম অবস্থায় রামানুজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন— পরে সে-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে এক পৃথক ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁর নূতন ধর্মমতে ভক্তির স্থান থাকলেও বর্ণাশ্রমের বন্ধন উঠে গেল। ব্যবহারিক

আচারের ওপর তিনি আর জোর না দিয়ে নীচ জাতীয়দের স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। তাঁর শিষ্যদের ভিতর রুইদাস চামার, ধন্না জাঠ, সেনা নাপিত ও কবীর জোলা। সে-পরিচয় কবীর নিজেই দিয়েছেন—

জাতি জুলাহা মতিকো ধীর।
হরষি হরষি গুণ রমৈ কবীর ॥—
মেরে রামকী অভৈপদ নগরী কহৈ কবীর জুলাহা।—
তু্ঁ ব্রাহ্মণ মৈঁ কাসীকা জুলাহা ॥—

কবীর যখন সাধনমার্গ অবলম্বন করেন তখন তিনি বালক— রামানন্দের বৃদ্ধ বয়স। শোনা যায় তিনি প্রথমে কবীরকে দীক্ষিত করতে রাজী হন নি। পরে একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি যখন গঙ্গাস্নান করে কাশীর ঘাট দিয়ে ফিরছিলেন তখন দৈবাৎ এক নীচজাতীয় সুপ্ত পথিককে স্পর্শ করেন। তাঁকে স্পর্শ করেই তিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন। সেই অস্পৃশ্য পথিকই বালক কবীর। তিনি রামানন্দের উচ্চারিত 'রাম নাম'কে গুরুদত্ত মন্ত্র মনে করে সাধনা সুরু করেন ও সিদ্ধ হন।

কবীরের জন্ম ও মৃত্যুকাল নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিতর সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ মত গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে কবীরের জন্ম হয়েছিল চতুর্দশ শতকের শেষভাগে (১৩৯৮-১৪০০) ও মৃত্যু হয়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথমে (১৫১৮)। কবীর দিল্লীর 'পাতশা' সিকন্দর লোদির সময়ে জীবিত ছিলেন। সিকন্দর লোদির মৃত্যু হয় ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে; তাহলে বলা যায় কবীর ও চৈতন্যদেব অনেকটা সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ ও মৃত্যু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে।

রামানন্দের সঙ্গে কবীরের সম্বন্ধ কতটা তা আমরা জানি না— তবে কবীরের রচিত যে-সব পদ সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাথ ও সহজ সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। এ-সব সম্প্রদায়ের সাধনার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে হঠযোগ, কাম্য হচ্ছে সহজজ্ঞান। কবীরের সাধনাও তাই। তা ছাড়া কবীরের রচিত পদের ভিতর ওইসব সম্প্রদায়ের সাহিত্যের ভাষা ও ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। ওইসব সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই প্রথম দোঁহা বা দ্বিপ্রথা-ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কবীরের বেশীর ভাগ রচনাতেই এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন সহজসিদ্ধ তিল্লোপাদের রচিত—

তু মরই জহি পবণ তাঁহ লীণো হোই নিরাস।
সঅসংবেঅণ তত্তফলু স কহিজ্জই কীস।

আর কবীরের রচিত—

জহাঁ ন চীড়ী চঢ়ি সকৈ রাই ন ঠহরাই।
মন পবন কা গমি নহীঁ তহাঁ পহুঁচে জাই ॥

এ দুই দোঁহার ভেতর যে শুধু ছন্দেরই মিল রয়েছে তা নয় ভাবেরও মিল আছে। উভয়েই মনপবনের গতিবিরহিত সহজ সমাধির কথা বলেছেন। কিন্তু ভাষা ও ভাবে এর চেয়ে গূঢ় সম্বন্ধ সিদ্ধসাধক সরহপাদ ও কবীরের কথার ভিতর। সরহপাদ বলেছেন যে সদ্‌গুরু হতে হলে নিজেকে আগে জানা চাই— যতক্ষণ নিজেকে জানতে না পারছ ততক্ষণ শিষ্য করো না, অন্ধ অন্ধকে চালিত করলে দু'জনই কূপে পড়ে।

জাব ণ অপ্পা জাণিজ্জই তাব ণ সিস্স করেই।
অন্ধং অন্ধ কঢ়াব তিম বেণ্ণ বি কুব পড়েই।

কবীরও অসদ্গুরুর সম্পর্কে অনুরূপ ভাষায় বলছেন—

জাকা গুরুজী অন্ধলা, চেলা খরা নিরন্ধ।
অন্ধে অন্ধা ঠেলিয়া, দুনু্ঁ্য কূপ পড়ংত।

সহজসিদ্ধদের আর একজন গুণ্ডরীপাদ ষট্চক্র বা সাধারণ অবস্থায় মনপবনের অভেদ্য স্থান সম্বন্ধে বলছেন—

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।

অর্থাৎ শ্বাসের ঘরে যে তালা দেওয়া রয়েছে তাকে ভাঙতে হবে। আর কবীর ওই কথাই আরও কিছু স্পষ্ট করে অনুরূপ ভাষায় বলছেন—

ষট্চক্র কি কনক কোঠরী বস্তু ভাব হৈ সোই।
তালা কুংচী কুলফকে লাগে, উঘড়ত বার ন হোই।

পূর্বাসিদ্ধদের রচনা ও কবীরের রচনার ভিতর ভাষা ও ভাবের ঐক্য ছাড়া কবীর নিজের মুখে তাঁদের গুরু বা আদর্শ সিদ্ধপুরুষ বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় গুরু রামানন্দের নাম ক্বচিৎ মেলে— যেমন 'কাশীমেং হম প্রগট ভয়ে হৈঁ রামানন্দ চেতাএ', কিন্তু হঠযোগে সিদ্ধ গোরখনাথ, ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের নাম তার চেয়েও বেশি পাওয়া যায়—যেমন 'অবধূ গোরষনাথি জাঁণী' (পৃঃ ১৪২), 'গোরষ ভরথরী গোপীচংদা, তব মন সোঁ মিলি করৈং অনংদা' (পৃঃ ৯৯),

ভরথরী ভুপ ভয়া বৈরাগী।
বিরহ বিয়োগী বণি বণি ঢু্ঁঢৈ,
বাকী সুরতি সাহিব সৌ লাগী। (পৃঃ ১৮৯)

পূর্বাসিদ্ধদের ও কবীরের রচনার ভিতর আর-একটা বড় ঐক্য আছে সাংকেতিক শব্দের ব্যবহারে। তাঁরা সকলেই ছিলেন মর্মবাদী বা mystic। তাই তাঁরা সাধনার গূঢ় কথা সহসা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করে সাংকেতিক শব্দের সাহায্য নিতেন। এইসব শব্দের সঠিক অর্থ গুরুর মুখ থেকেই উপলব্ধি হ'ত।

পূর্বাসিদ্ধেরা মনপবন বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'মূষিক' বলেছেন, তার কারণ আঁধার ঘরে মূষিকের ব্যবহার চঞ্চল, সে চুরি করে খায়। মনপবনের সাধারণ অবস্থাও চঞ্চল, যখন সাধক যোগস্থ হন তখন সে-পবন স্থিরীকৃত হয়ে দেহের ভিতরের ষট্চক্র ভেদ করে সহস্রারে অমৃত পান করে— তাই পূর্বাসিদ্ধেরা যেমন বলেছেন—

নিসি অন্ধারী মুসা অচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা॥

কবীরও তেমনি বলেছেন—

মনরে জাগত রহিয়ে ভাই।
গাফিল হোই বর্সাত মতি খোবৈ,
চোর মুসৈ ঘর জাই।

প্রাচীন সহজসিদ্ধ বীণাপাদ যখন যোগস্থ হয়ে তন্ত্রী বাদন করেন তখন তাঁর বীণের তন্ত্রী

হচ্ছে সূর্য চন্দ্র অর্থাৎ দেহের ভিতরকার দুই নাড়ী, ইড়া ও পিঙ্গলা। সে-তান্ত্রিকার দণ্ডী, অবধূতী বা মধ্যমা নাড়ী সুষুম্না, যাতে বা অনাহত শব্দ নাদিত হয়। আর সেই অনাহত ঝুণু ঝুণু শব্দ চিত্তগগনে প্রতিধ্বনিত হয়—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী এাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।

সেই সময়ে কখনো-কখনো তিন পাটে বা নাড়ীতে ভয়ংকর শব্দ শ্রুত হয়—

তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘন গাজই।

আর কবীরও সেই যোগের কথাই অনুরূপ সাংকেতিক ভাষায় বলছেন—

জংত্রী জংত্র অনুপম বাজৈ, তাকা শবদ গগন মৈঁগাজৈ।—
সুরকী নালি সুরতি কা তুংবা, সৎগুরু সাজ বনায়া।—

অথবা—

অবধূ নাদৈঁ ব্যংদ গগন গাজৈ, সবদ অনাহদ বোলৈ।
অংতরি গতি নহীঁ দেখৈ নেড়া, ঢুংঢ়ত বন বন ডোলৈ॥

এই থেকেই বোঝা যাবে যে প্রাচীন সিদ্ধদের ও কবীরের সাধনা ও রচনার ভিতর সম্বন্ধ কত নিকট। সুতরাং যে-সময় থেকে আমরা মধ্যযুগের সূত্রপাত মনে করি সে-সময়ে কোনো নূতন যুগ প্রবর্তন তো হয় নি, বরং প্রাচীন সাধনা ও চিন্তার ধারা লোপ না পেয়ে নূতন সাধকদের হাতে প্রসার লাভ করছিল ও ভারতীয় সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করে তুলছিল। অথচ কবীরের আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই কত না রাজনৈতিক বিপ্লব উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনকে উদ্বাস্তু করেছে!

এইবার কবীরের শিক্ষার মূলসূত্রগুলির পরিচয় দেব। পূর্বেই বলেছি কবীর মর্মবাদী বা mystic। তিনি নিজে মুখেই স্বীকার করেছেন যে তিনি 'বাউর', অর্থাৎ বাউল বা বাতুল, তিনি 'অবধূ' বা অবধূত। সর্বোপরি 'কবীর হীরা-বণজিয়া মান-সরোবর তীর' অর্থাৎ তিনি মানসসরোবরের তীরে হীরার বণিক। সে-মানসসরোবর জলে পূর্ণ, সেখানে হংস কেলি করে, মুক্তাফল থেকে মুক্তা প্রসূত হয়, গগন অমৃত বর্ষণ করে ও কমল প্রকাশিত হয়।

মানসরোবর সুভর জল, হংসা কেলি করাহিঁ।
মুকুতাফল মুকুতা চুগৈঁ, অব উড়ি অনত ন জাহিঁ॥
গগন গরজি অংমৃত চবৈ, কদলী কঁবল প্রকাস।
তহাঁ কবীরা বন্দিগী, কৈ কোই নিজ দাস॥

সুতরাং যে-মানসসরোবরের তীরে কবীর হীরা বেচাকেনা করেন সে-সরোবর চিত্তে। হংসরূপী আত্মা বা ব্রহ্ম সেখানে কেলি করেন, সহস্রদল পদ্ম সেখানে প্রকাশ পায় ও চিত্তগগন অমৃতে মধুময় হয়। যোগী কবীর সমাধিস্থ হয়েই সেখানে হীরার ব্যবসা করেন। সেই কথাই স্পষ্ট করে কবীর অন্যত্র বলছেন—

সরীর সরোবর ভীতরৈ আছে কমল অনূপ।
পরমজ্যোতি পুরুষোত্তমো জাকৈ রেখ ন রূপ।

[শরীর সরোবরের ভিতর এক অনুপম কমল আছে। আর সেখানে পরম জ্যোতির্বিশিষ্ট অসীম ও অরূপ পুরুষোত্তম বিদ্যমান।]

কবীর তাঁর সাধনমার্গকে সূক্ষমার্গ বলেছেন। সে-মার্গ আধ্যাত্মিক, তাকে অবলম্বন না করলে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না। কে কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় যাবে তাও বুঝতে পারা যাবে না। সে-পথ সাধারণত দুর্গম, কেউ সে-পথে সহজে যেতে পায় না—

কবীর মারিগ কঠিন হৈ, কোই ন সকই জাই।

সে-পথ ধরে কবীর এত দূরে উঠতে পেরেছেন, যেখানে পাখিরও গতিবিধি নেই; মুনিজনেরা সুরনরেরা হতাশ হয়ে বসে থাকেন কিন্তু কবীর সৎগুরুকে সাক্ষী রেখে সেই অগম্য মার্গ বেয়ে এক উচ্চস্থানে ঘর বেঁধে বাস করেন—

জহাঁ ন চীঁড়ী চাড় সকৈ, রাই ন ঠহরাই।
মন পবনকা গমি নহীঁ তহাঁ পহুঁচে জাই।
কবীর মারগ অগম হৈ, সব মুনিজন বৈঠে থাকি।
তহাঁ কবীরা চলি গয়া, গহি সৎগুরু কী সাখি।
সুরনর থাকে মুনিজনাঁ, জহাঁ ন কোই জাই।
মোটে ভাগ কবীরকে, তহাঁ রহে ঘর ছাই॥

সেই অগম্য স্থানে পৌঁছুতে হলে সৎগুরুর সাহায্য আবশ্যক। সৎগুরুই সকল জগতের রহস্য অবগত করিয়ে দেন ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। যে-গুরু মিললে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় সে-গুরুকে ভোলা যায় না, তিনি সংশয় ও ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করেন, তিনি শান যন্ত্র, মনের ময়লা ছাড়িয়ে চিত্তকে দর্পণের ন্যায় করেন, তিনি ধোবী, আর শিষ্য কাপড়, প্রেমরূপ শিলায় যখন তিনি সেই কাপড় ধৌত করেন তখন আবার জ্যোতি প্রকাশ হয়। তাই কবীর বলছেন—

জগৎ জানায়ো যোহি সকল, সো গুরু প্রগয়ে আয়ে।
যিন্‌হ আঁখিয়ন্‌হ গুরু দেখিয়োঁ সো গুরু দোহিঁ লখায়ে।
কবির সংশয় খায়া সকল জগ্‌, সংশয় কোই না খায়।
যো বেধা গুরু অচ্ছর, সো সংশয় চুনি খায়।
কবির শিক্‌লি গর্‌, কিজিয়ে সব্দ সস্কলা দেই।
মন্‌কা মৈয়ল ছোড়াইকে, চিৎদরপণ্‌ করি লেই।
কবির গুরু ধোবি, শিষ কাপ্‌ড়ো, সাবন পৃজান হার।
সুরতী শিলাপর ধোইয়ে, নিক্‌লে জ্যোতি অপার॥

যখন সেই সৎগুরুর উপদেশ লাভ হয় তখনই প্রেমবারি বর্ষিত হয়। তখন কবীর হর্ষে বিভোর হয়ে বলেন—

বাদল প্রেম্‌কা হম পরি বরষ্যা আই॥

সৎগুরুর কৃপায় যখন চিত্ত দর্পণের মতো পরিষ্কার হয়, সংশয় ও ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়—তখন ধ্যান অবলম্বন করেই, কবীরের মতে সাধক গম্য স্থানে পৌঁছুতে পারেন। এই ধ্যানকেই কবীর বলছেন 'সুমিরণ' বা স্মরণ। স্মরণই সাধনার সার,— সুমিরণ সার হৈ ঔর

সকল জঞ্জাল। কিন্তু স্মরণ কাকে করতে হবে— সে-কথাও কবীর বলেছেন। স্মরণ করতে হবে রামকে, রামই শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় নাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, নারদ শুকদেব প্রভৃতি ঋষিগণ, সনক ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে রামকেই স্মরণ করেছেন—

কবির রামনাম সুমিরণ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্।
কহেহিঁ কবীর সুমিরণ করে নারদ শুকদেব্ শেষ ॥
কবির সনকাদি সুমিরণ করে নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।

কিন্তু কবীরের রাম সগুণ দেবতা নন, নির্গুণ নিরাকার ও শব্দরূপী, অর্থাৎ তিনিই শব্দব্রহ্ম। পরবর্তী কালের বৈষ্ণবের ন্যায় সে-রামকে সখা দাস বা পুত্রভাবে সেবা করাই সাধনার কাম্য নহে। সেই রামরূপ শক্তিকে জাগ্রত করে সমাধির উন্মনী অবস্থাই সাধনার কাম্য। রামরূপী সেই শব্দব্রহ্ম অলক্ষ্য— তাঁকে লক্ষ্য করা যায় না।

কবির ওয়াকি গতি আস্ অলখ্, অল্খ লখা নেহি যায়।
শব্দ স্বরূপী রাম হায়, সব ঘাট্ রহা সমায়।

যখন সেই শব্দস্বরূপী রাম লাভ হয় তখন চিত্ত উন্মনী হয় ও শূন্যে বা গগনে প্রবেশ করে। সেখানে চাঁদ নেই অথচ চাঁদিমা বা জ্যোতি আছে, অলক্ষ্য নিরঞ্জন রাজা রাম সেইখানেই বিদ্যমান—

কবির মন লাগা উন্মুনী সোঁ, গগণ্ পহুচা যায়।
চাঁদ বিহুনা চাঁদনী, তাঁহা অলখ্ নিরঞ্জন রায়।

আর যখন কবীবের সেই রাম মেলে না, অর্থাৎ তাঁর চিত্ত উন্মনী হতে পায় না তখনই তিনি বিরহকাতর হয়ে ওঠেন। তখন তিনি অনাথ, বিরহভুজঙ্গ তাঁর দেহ মনকে দগ্ধ করতে থাকে, সে দারুণ দুঃখ তাঁর অসহনীয় হয়; প্রতি শিরায় অনাহত রাম নাম ধ্বনিত হয়, আর তিনি তা শুনতে পান না। তখন সেই রাম-বিরহব্যথায় কাতর কবীর বলেন—

ইসু তন মন মধ্যে মদন চোর।
জিন জ্ঞান রতন হরি লীন মোর।
মৈঁ অনাথ প্রভু কহোঁ জাহি।
কী কৌন বিগৃতো মৈঁ কো আহি।
মাধব দারুণ দুঃখ সহ্যে ন আই।
মেরো চপল বুদ্ধি স্যোঁ কহা বসাই।
কবীর বিরহ ভুজঙ্গম তম্ ডছেও মন্ত্র না লাগে কোই।
রাম বিয়োগী ন জীঁয়ে জীঁয়ে তো বাউর হোয়।
কবীর রগ্ রগ্ বজে রবাব তন্, বিরহ সম্ভায়ে নিৎ।
অওর ন কোই শুন্সি, সাঁই শুনে কি চিৎ।

কিন্তু বিরহে পাগল না হলে মিলন হয় না। তাই যেমন প্রিয়তম রামের নাম স্মরণ করা সাধনার অঙ্গ তেমনি তাঁর বিরহে পাগল হওয়া আবশ্যক। পাগল না হতে পারলে—

কোন্ জগাওয়ে ব্রহ্মকো, কোন্ জগাওয়ে জীউ।
কোন্ জাগওয়ে সুরতিকো কোন্ মিলাওয়ে পিউ।

কে ব্রহ্মকে জাগাবে? কে জীবনকে জাগাবে, কেই বা প্রেমকে জাগাবে, কেই বা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত করবে? তার উত্তর কবীর নিজেই দিয়েছেন—

কবীর বিরহ জগাওয়ে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম জাগাওয়ে জীউ।
জীউ জগাওয়ে সুরতিকো, সুরতি মিলাওয়ে পীউ।

বিরহই ব্রহ্মকে জাগ্রত করে, ব্রহ্ম চিত্তকে, চিত্ত প্রেমকে জাগ্রত করে। তখনই বিরহের অবসান। তাই এ-প্রেমও দুর্লভ। কবীর তাঁর রচনায় আক্ষেপোক্তি করেছেন যে সকলেই প্রেম প্রেম বলে, কিন্তু প্রেম কেউ চেনে না, এ-প্রেম সহজে পাওয়া যায় না। কবীর নিজের দেহকে জ্বালিয়ে কালী প্রস্তুত করেন, আর সেই কালীতে রাম লিখে যখন রামকে পাঠাতে পারেন তখনই তিনি প্রেম বুঝতে পারেন। অর্থাৎ স্মরণে ও বিরহে তন্ময়তা না আসলে সত্য প্রেমিক হওয়া যায় না—

প্রেম প্রেম সব্হিঁ কহে প্রেম না চিহ্নে কোয়।
যোঁহি ঘট্ প্রেম্ পিঞ্জরে বসে, প্রেম্ কহাবয়ে সোয় ॥

কবির প্রেম্ ন চিন্হিয়া, চাখি ন চিহ্নো সোয়াদেয়।
সুনে ঘরকা পাহুনা, যেঁও আওয়ে তেঁও যায় ॥

যহু তন জালোঁ মঁাস করোঁ, লিখোঁ রামকা নাউঁ।
লেখনিঁ করুঁ করংক কী, লিখি রাম পঠাঁউ।

সে-অবস্থা আদর্শ পতিব্রতা নারীর অবস্থা। সে-অবস্থায় কবীরের চিত্তে রাম ব্যতীত আর কারো রূপ প্রতিভাত হয় না, আঁখি দিয়ে আর কাউকে দেখতে পান না। তখন পাপিয়ার মতো এক স্বাতি বিন্দুর আশায় তিনি সমস্ত সমুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করেন ও অবলা নারীর ন্যায় প্রিয়কে ডাকেন, সে প্রিয়তম এক, তিনি শূন্যরূপী নির্গুণ রাম— অপর কেউ নয়—

কবীর নয়না ভিতর আউতুঁ তেঁহ নয়ন ঝপেহু।
নাহি দেখ আওরকোঁ, না তু দেখ ন দেহু।
কবীর বারবার কেয়া আঁখিয়া, মেরা মন কি শোয়।
কলিতো উথলি হোয়্গি সাঁই আওর ন কোয়।
কবীর রহে সমুদ্রকে বীচমে, রটে পিয়াস পিয়াস।
সকল সমুদ্র তিনুকা গণে, এক স্বাতি বুন্দাকি আস।
কবির মঁয় অবলা পিউপিউ করোঁ নিরগুণ্ মেরা পিউ।
শূন্য সনেহি রাম বিনু আওর ন দেখো পিউ ॥

যখন সেই শূন্যস্বভাব, নিরাকার ও নিরঞ্জন রামের সহিত মিলন সাধিত হয় তখনই কবীরের সহজ জ্ঞান লাভ হয়। তাই কবীরকে অনেকে সহজধর্মী মনে করেন। এ সহজ ধর্ম কি? কেউ কেউ মনে করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা হতে মুক্তিলাভই হচ্ছে এই সহজ ধর্মের প্রধান লক্ষণ। এ-ধর্ম কোনো শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করে না—বাইরের আচার ব্যবহারের অনুশীলনকেও ধর্মের অঙ্গ মনে করে না। তাই কবীরের রচনায় অনেক স্থলেই পাষাণ বা দেবদেবীর পূজা, তীর্থভ্রমণ, পণ্ডিতের কূটতর্ক প্রভৃতির ওপর কটাক্ষ রয়েছে। তাঁর মতে এর কোনোটিতেই মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু তাই বলে কবীরের সহজ

ধর্মকে natural religion of man বলা চলে না। তাঁর 'সহজ' 'natural' বটে কিন্তু মৌলিক বা ব্যবহারিক হিসাবে নয়, পারমার্থিক হিসাবে। সে-সহজ কবির সহজ নয়,— সে-সহজ লাভ করতে হলে গুরুর দেওয়া মন্ত্র ও যোগসাধনার আবশ্যক। এই সহজ সম্বন্ধে যখন চণ্ডীদাস বলছেন—

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে ?
তিমির অন্ধকার, যে হয়েছে পার, সহজ জানিবে সে।

কবীরের দোহাতেও সেই একই আক্ষেপ অনুরূপ ভাষায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

সহজ সহজ সব্‌কো কহৈ, সহজ ন চীন্‌হৈ কোই।
জিন্‌হ সহজৈ বিষিয়া-তজী, সহজ কহাঁজৈ সোই।
সহজ সহজ সব্‌কো কহৈ, সহজ ন চীন্‌হৈ কোই।
জিন্‌হ সহজৈ হরিজী মিলৈ, সহজ কহীজৈ সোই।

এই সহজ জ্ঞান লাভ করলে যোগী আদর্শ যোগীপদ লাভ করেন, তখন তিনি একেলা উদাসীনভাবে ভ্রমণ করেন, বাইরের চিহ্ন ধারণ করেন না, কারণ সহজানন্দের আনন্দে তিনি বিভোর, অনাহত বেণু বাজিয়ে তিনি চলাফেরা করেন—

বাবা জোগী এক অকেলা, জাকৈ তীর্থ ব্রত ন মেলা।
কোলী পত্র বিভূতি ন বটবা, অনাহদ বেন বজাবৈ।
মাগি ন খাই ন ভূখা সোবৈ, ঘর অঙ্গন ফিরি আবৈ।

তখন বহির্জগতের সুখদুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হয় না, বাস্তব জগতের কোনো আঘাতেই মন চঞ্চল হয় না— সে হচ্ছে এক উদাস অবস্থা। তাতে ভাব-অভাব নেই, পাপ-পুণ্য নেই, রাগ-বিরাগ নেই। সে-সহজ স্বভাবতই নির্মল। সে-সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হলে স্কন্ধ ভূত আয়তন ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়, তাই সহজ নির্গুণ ও শূন্যস্বভাব। সে-সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ চোখে তাকে দেখা যায় না, ত্বক্ দিয়ে তাকে স্পর্শ করা যায় না, ঘ্রাণে তার আঘ্রাণ পাওয়া যায় না— তাই পূর্বাসিদ্ধেরা তাকে 'গ্রাহ্য-গ্রাহক-বিবর্জ্জিত' বলেছেন। আত্মস্থ হয়েই শুধু সে-সহজ উপলব্ধি হয়। সে-অবস্থায় চিত্তের আসা-যাওয়া থাকে না। তাই 'সহজ' লাভ করতে পারলে মায়ার প্রতিকৃতি বহির্জগতের সঙ্গে বন্ধন টুটে না, আশ-পাশ খণ্ডিত হয় না, অপার নির্মল আনন্দ অনুভূত হয় না—

আসাপাস ষংড় নহীঁ পাড়ে যোঁ মন সূঁনি ন লুটৈ।
আপা পর আনন্দন বুঝৈ, বিন অনভৈ কূঁ ছুটৈ।
কহ্যাঁ ন উপজৈ উপজ্যাঁ নহি জানৈঁ ভাব অভাব বিহুনাঁ।
উদৈ অস্ত জহাঁ মতি চুষি নাঁহীঁ, সহজ রাঁম ল্যো লীনাঁ।

সুতরাং এই ভাব-অভাব-বিহীন সহজকেই কবীর খোঁজ করতে বলছেন—

আবৈ না যাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী।

কিন্তু এ-সহজ কীসে লাভ হবে ? বেদ পুরাণ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে এ-সহজ মেলে না। তীর্থস্থান, পূজা বা দেবমূর্তিতেও তা পাওয়া যায় না।

ক্যা পাঢ়য়ে ক্যা সুনিয়ৈ ক্যা বেদপুরাণা সুনিয়ৈ।
পঢ়ে সুনৈ ক্যা হোই, জোঁ সহজ ন মিলিয়ো সোই।

যোগ অবলম্বন করেই এ-সহজ লাভ হয়— সে-যোগ সিদ্ধাচার্যদের হঠযোগ। এই যোগে ষটচক্র ভেদের কথা রয়েছে। শক্তি জাগ্রত হলে প্রাণবায়ু বা মনপবন সেই ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারে আরোহণ করে। যোগী তখন সহজ সমাধিতে মগ্ন হন। প্রাণবায়ুকে সহস্রারে যেতে হলে সুষুম্না নাড়ী বেয়ে উঠতে হয়। প্রাণবায়ু যখন অন্য দুই নাড়ী ইড়া পিঙ্গলা দিয়ে যাওয়া আসা করে তখন বহির্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্পূর্ণ যোগ থাকে ও মায়াশক্তির সৃষ্টি চলতে থাকে। প্রাণবায়ু যখন সুষুম্নাগত হয় তখন বহির্জগতের সঙ্গে যোগ.র সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, অবিদ্যা কেটে যায়, প্রাণবায়ুর চঞ্চলতা নষ্ট হয়, আসা-যাওয়া বা অনাগমন বন্ধ হয়। তাই কবীর বলছেন—

উলটত পবন চক্রষট ভেদে সুরতি সুন্ন অনুরাগী।
আবৈ ন জাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী।—
সুঁনি মণ্ডল মৈঁ মংদলা বাজৈ, তাহা মেরা মন নাচৈ।
গুরু প্রসাদি অমৃতফল পায়া সহজি সুষমনঁা কাছৈ।—
ইলা প্যংগুলা ভাটী কীহি ব্রহ্ম অগনি পরজারী।
ইড়া পিংগলা সুষমন বংদে যে অবগুন কতজাহীঁ।

ইড়া পিঙ্গলাকে প্রাচীন সিদ্ধেরা চন্দ্র সূর্য আখ্যা দিয়েছেন, কারণ সে দুই নাড়ীতে যখন প্রাণবায়ু থাকে তখন কালজ্ঞান সম্পূর্ণ .বর্তমান— দিবারাত্রির ভেদজ্ঞান থাকে— তাই কবীরও বলছেন—

চংদ সুর দোই ভাটী কীহী সুষমনি চিগবা লাগীরে—

সহজসিদ্ধ কবীরের নিকট বাইরের তীর্থের কোনো আবশ্যকতা নেই— তাঁর দেহের মধ্যেই সব বিদ্যমান—

রে মন বৈঠি কিতৈ জিনি জাসী
হিরদৈ সরোবর হৈ অবিনাসী।
কায়া মধে কোটি তীরথ, কায়া মধে কাসী।
কায়া মধে কবলাপতি কায়া মধে বৈকুণ্ঠবাসী।
উলটি পবন ষটচক্রনিবাসী, তীরথরাজ গংগ তটবাসী।
গগন মণ্ডল রবি সসি দোই উলটী কুংচী লাগি কিরারা।
কহৈ কবীর ভই উজিয়ারা পংচ মারি এক রহ্যো নিনারা।

সুযুম্না বেয়ে প্রাণবায়ু যখন সহস্রারে আরোহণ করে তখন যোগী সমবশীভূত বা সহজানন্দে বিভোর হন। সেই সমাধির অবস্থাতে আনন্দ উপভোগ করাকে সুধা বা অমৃতপানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সে-সুধারস যা নির্ঝরধারে বর্ষিত হয় কবীরও তা পান করেছেন—

সুরতি পিয়াস সুধারসু অমৃত এহু মহারসু পেউরে।
নিরঝর ধার চু ঔ অতি নির্মল ইহরস মনুআ রাতোরে।
অচরজ এক সুনহুরে পংডিয়া অর কিছু সহন ন জাই।
সুর নর গণ গন্ধ্রব জিন মোহে ত্রিভুবন মেখলি লাই।
রাজা রাম অনহদ কিংগুরী বাজৈ।
জাকী দৃষ্টি নাদ লব লাগৈ।

ভাটী গগন সিঁড়িয়া অরু চুঁড়িয়া কনক কলস এক পায়া।
তিস মহিধার চুএ অতি নির্ম্মল রস মহি রস ম চুআয়া।

মোটামুটি এই হচ্ছে কবীরের মর্মবাদ।

তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের খোঁজ বেশি না পেলেও তাঁর সাধনার ধারা আমরা অল্পায়াসেই ধরতে পারি। পূর্বসিদ্ধদের ধারাই তিনি অনুসরণ করেছিলেন—তবে প্রাচীন সিদ্ধদের রচনা বেশির ভাগ সংস্কৃতে, না হয় অপ্রচলিত প্রাকৃতে, আর কবীরের রচনা দেশভাষায়, কারণ কবীরের কথায় 'সংস্কৃত কূপ জল ভাষা বহতা নীর'—সংস্কৃত কূপের জলের ন্যায় বদ্ধ, আর দেশভাষা বহতী নদীর ন্যায় প্রাণবতী। কবীরের রচনা শুধু দেশভাষায় বললেই ঠিক হ'ল না— তাঁর নিজের প্রতিভা ছিল। সেই প্রতিভার গুণেই তিনি মধুর পদবিন্যাস করতে পেরেছেন—তাই তাঁর বাণী আমাদের মর্মে পৌঁছায়। সাধনায়ও তিনি নূতন ভাবের সন্নিবেশ করতে পেরেছেন। সর্বসিদ্ধেরা সমাধিস্থ হয়ে শুধু শূন্যে বিচরণ করতেন, না হয় কমলবনে মধুপান করতেন, কিন্তু কবীর সমাধিস্থ হয়ে গোবিন্দ বা রামের সঙ্গে মিলিত হন। সে-রাম নিরাকার, নিরঞ্জন ও শূন্যস্বভাব হলেও কবীরের এই ভাব-সমাধি বেশি মধুর। সে-সমাধি অনাহত বাঁশীর ধ্বনিতে মুখরিত। তাই সমাধি বিয়োগ বা বিরহের অবস্থা কবীরের পক্ষে অত ক্লেশজনক।



চীনাদের প্রাচীন সভ্যতা

ভারতের আর্যসভ্যতার মতোই অনেকটা চীনাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুনদের তীর থেকে আর্যরা যেমন ভারতের নানা দিকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আদান-প্রদান সুরু করেন ও তাঁদের আর্যসভ্যতায় দীক্ষিত করেন, প্রাচীন চীন জাতিও অনেকটা সেইভাবে সমস্ত চীন দেশে তাঁদের সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন। খৃষ্টের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে মুষ্টিমেয় চীনজাতি পীতনদীর (বা হোয়াং হো-র) উভয় তীরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বহু নদী এ-দেশের পূর্বদিকটাকে উর্বর করে তুলেছে। এ-সব নদীর ভিতর সবচেয়ে বড় হচ্ছে উত্তরে হোয়াংহো বা পীত নদী। দক্ষিণে ইয়াং চে কিয়াং। এ-সব নদীর উপত্যকাগুলি খুব উর্বর। তাই পীত নদীর উভয় তীরে প্রাচীন চীনজাতি বসবাস আরম্ভ করেই কৃষিকার্য সুরু করলেন এবং সেই সূত্রেই তাঁদের সভ্যতার গোড়া পত্তন হ'ল।

এই চীনজাতি আর্যদের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং আশ্চর্য উদ্ভাবন শক্তি ছিল। তাই নিজেদের সভ্যতাকে উন্নত করতে এঁদের বেশী দিন লাগে নি। সমস্ত দক্ষিণ চীনে তখন নানা বর্বর জাতির বাস। উত্তর চীনে মঙ্গোলীয়দের বাস। এদের ভিতর ক্রমশ চীনজাতি তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং নিজেদের সভ্যতার কোঠায় এদের তুলে নিলেন। সমস্ত চীনদেশকে এইভাবে গড়ে তুলতে এঁদের প্রায় দু'হাজার বছর লেগেছিল। খৃষ্টের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে চীনজাতি একটা মহাজাতিতে উন্নীত হয়েছে দেখতে পাই। সমস্ত চীনদেশের ওপর তাঁদের আধিপত্য তখন অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে।

আমরা চীন, মঙ্গোলীয় জাপানী প্রভৃতি জাতিকে এক কোঠায় ফেলে থাকি। কিন্তু এ-সব জাতিকে ভালো করে দেখলে আমাদের ভুল বুঝতে পারবো। জাপানী, মঙ্গোলীয় তুর্ক প্রভৃতি জাতিকে এক কোঠায় ফেলা যায়। চীনারা কিন্তু একটা ভিন্ন জাতি। বিদ্যা, বুদ্ধি ও উদ্ভাবন-শক্তিতে এঁরা অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলেন। চীনদেশের দক্ষিণ অংশের লোকেরা অবশ্য মালয়জাতির শাখামাত্র ছিল। পরে চীনাদের সঙ্গে মিশে গেছে। সেইজন্য দক্ষিণ চীনের অধিবাসীরা কালো ও উত্তর চীনের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পীতবর্ণ।

পূর্বেই বলেছি চীনজাতির ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ খৃষ্টের জন্মের একাদশ শতক পূর্বে। চীনদেশ তখন নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত; কিন্তু সবচেয়ে যেটা পরাক্রমশালী রাজবংশ—চৌবংশ (Chou) সবাই তার আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এই চৌবংশের রাজারাই প্রায় নয়শত বছর ধরে সমস্ত চীনের সম্রাট হিসাবে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের সময়েই চীনাদের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। চৌবংশের তিরোধানের পর চীন বংশের রাজারা সমস্ত চীনের অধিপতি হন। এই বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা শে-হোয়াং-তি সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। ভারতবর্ষ ও চীনের এই দুই সম্রাটের কার্য-

কলাপের ভিতর অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষে একছত্র আধিপত্য বিস্তার ও সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শে-হোয়াং-তিও সমস্ত চীনদেশকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। এজন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছিল ও ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর রাজাদের উচ্ছেদ-সাধন করতে হয়েছিল। অশোক ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করবার প্রয়াস করেছিলেন। শে-হোয়াং-তিও মধ্য এশিয়ার নানা রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। অশোকের মতোই তিনি চীনদেশকে একটা বড় সাম্রাজ্যে পরিণত করে বহির্জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে এ দুই সম্রাটের ভিতর পার্থক্যও যথেষ্ট দেখা যায়। অশোক ছিলেন পরম ধার্মিক, শে-হোয়াং-তি ছিলেন নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে তিনি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ সেগুলি ছিল তাঁর একাধিপত্য স্থাপনের অন্তরায়। অশোক নানা দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, আর শে-হোয়াং-তি পাঠিয়েছিলেন মঙ্গোলীয় শত্রুদের থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মিত্র খুঁজতে। অশোকের সাম্রাজ্য তাঁর কিছু পরেই ধ্বংস হয়ে গেল. কিন্তু চীনসাম্রাজ্য সমস্ত এশিয়া খণ্ডে সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠলো। শে-হোয়াং-তি নিজের জাতিকে এমন উন্নত করে রেখে গেলেন যে ত'ার বংশের নামে সমস্ত দেশের নামকরণ হ'ল। চীন-বংশের নাম থেকেই বহির্জগতে এদেশ চীনদেশ নামে পরিচিত হ'ল, ও এই জাতিও চীন আখ্যা পেলেন। এর পূর্বে চীনদেশের নাম ছিল 'চোং কুও' অর্থাৎ 'মধ্যদেশ'। প্রাচীন কালে চীনাদের ধারণা ছিল যে তাঁদের দেশ পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থিত। শে-হোয়াং-তির পরেই প্রবল 'হান' রাজবংশের আবির্ভাব। এ-বংশের রাজারা প্রায় পাঁচ শো বছর রাজত্ব করেছিলেন খৃষ্টের দু'শো বছর পূর্ব থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। এই সময়ে চীনজাতি প্রায় সমস্ত জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান আরম্ভ করলো। জাপান থেকে মিশর এবং সাইবেরিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমস্ত দেশে চীনারা যাতায়াত সুরু করলেন ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। সমস্ত মধ্য এশিয়া চীনাদের করতলগত হয় এবং পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে চীনদেশ পর্যন্ত পথ নিরাপদ করা হ'ল। এই সময়েই ভারতীয়েরা মধ্য এশিয়া হয়ে যবদ্বীপ ও চম্পা প্রভৃতি হয়ে জলপথে চীনদেশে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতীয় বৌদ্ধেরা চীনে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা আরম্ভ করলেন। ভারতের সঙ্গে এই যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল সে-সম্বন্ধ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরের ওপর অটুট ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারত ও চীন উভয় দেশই এই সময়ে বিপর্যস্ত। সেই দুর্যোগের দিনেই তাঁদের সেই হাজার বছরের অটুট সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর এই সুদীর্ঘ সাত শো বছর ধরে ভারত আর চীনের খোঁজ করে নি, সে-সম্বন্ধ আর পুনরায় স্থাপনের প্রয়াস করে নি।

এইবার চীনাদের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চীনাদের ভাষা হচ্ছে এক বর্ণাত্মক অর্থাৎ Mono-Syllabic। আমাদের ভাষায় যেমন নানা বর্ণের সমন্বয় করে শব্দের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ 'পিতা' বলতে পি ও তা এই দুই বর্ণের সংযোগ করতে হয়, চীনাদের কিন্তু তা নয়। এক বর্ণেই তাঁদের শব্দের চরম পরিণতি। তাই পিতা বলতে তাঁরা বলবেন 'ফু' 'মাতা' বলতে 'মু' 'সূর্য' বলতে 'জ' নদী বলতে 'হো' বা 'কিয়াং' ইত্যাদি। কিয়াং উচ্চারণ এক বর্ণের মতোই শোনায়। স্থান-ভেদে এই ভাষায় উচ্চারণের

ভেদও আছে। পশ্চিমবঙ্গের লোক যেমন পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানের কথা বুঝতে পারে না, ক্যান্টনের লোকও তেমনই উত্তর চীনের কথা বুঝতে পারেন না। সমস্ত চীনদেশে প্রায় নয়-দশ রকমের উচ্চারণ ভেদ আছে। তবে শিক্ষিত লোকেরা বহুদিন ধরে উত্তর চীনের উচ্চারণ শিখে থাকেন। এই উচ্চারণ-পদ্ধতিকে বলা হয় 'কুয়ান-হুয়া' বা 'মান্দারিণ'। এই উচ্চারণ-পদ্ধতি সেকালে রাজধানীতে প্রচলিত ছিল, সেইজন্যই রাজ কর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদের এটা জানা আবশ্যক হ'ত।

উচ্চারণে প্রভেদ থাকলেও চীনা ভাষা সর্বত্র একই প্রকারে লেখা হয়ে থাকে। লেখার এই পদ্ধতি অতি অদ্ভুত। এই লেখাই যেন সমস্ত চীন-সভ্যতার চারিধারে একটা বড় প্রাচীর তুলে রেখেছে। এই লেখা দন্তস্ফুট করে চীনাদের সভ্যতার ভিতর প্রবেশ করা খুব কষ্টসাধ্য হলেও আমাদের তা করতে হবে। ভয়ে পেছুলে চলবে না। শব্দকে বিশ্লেষণ করে আমরা বর্ণমালা ও প্রতিবর্ণের জন্য একটা অক্ষরের সৃষ্টি করেছি। সুতরাং যে-কোন শব্দ হোক না কেন আমরা এই বর্ণমালার ভিতর ধরে নিয়ে অক্ষরে লিখতে পারি, কিন্তু চীনারা প্রতিবর্ণের জন্য অক্ষর সৃষ্টি না করে প্রতিশব্দের word-এর জন্য অক্ষর সৃষ্টি করেছেন। তাই 'গাছ' ও 'গামছা' এই দুই কথা লিখতে কোনও সাধারণ অংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। দুটি কথার জন্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি অক্ষর লিখতে হবে। কিন্তু 'গাছ ও 'বনের' ভিতর একটি সাধারণ বস্তু আছে। কারণ বন হচ্ছে বহু গাছের সমাবেশ। চীনাদের লেখা যেন চিত্র। খৃষ্টের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে তারা এই লিপির সৃষ্টি করে। এই লিপির যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, চীনেরা কোনো বস্তুকে বোঝাতে গিয়ে তাকে চিত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 'সূর্য' লিখতে গিয়ে তাঁরা একটা বৃত্ত এঁকেছেন, চন্দ্রের পরিবর্তে চন্দ্রকলা এঁকেছেন। মানুষ, গাছ, পর্বত প্রভৃতি সমস্ত কথারই তাঁরা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

এই লিপির ক্রমবিকাশ অনেকদিন ধরে হয়েছিল। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখতেই পাই যে তাঁরা idea-কেও চিত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 'উজ্জ্বল' বোঝাতে গিয়ে তাঁরা সূর্য ও চন্দ্রের এবং 'শুভ' বা 'ভালো' বোঝাতে গিয়ে মাতা ও পুত্রের একত্র সমাবেশ করেছেন। অরণ্য বোঝাতে গিয়ে দুটি গাছ পাশাপাশি লিখেছেন। এই শ্রেণীর বহু কথা চীনা ভাষায় আছে। এভাবে ক্রমবিকাশের ফলে তাঁদের ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দের জন্য একটা চিত্র আঁকতে হ'ল। সাহিত্যের উন্নতির ফলে ভাষায় নূতন কথার সৃষ্টি হ'ল। তাই চীনা ভাষায় বর্তমান কালে প্রায় চল্লিশ হাজারের ওপর বিভিন্ন চিত্র আছে। এই সমস্ত চিত্রকে ২১৪ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। মূল শব্দ (root) নিয়ে এক একটি শ্রেণীর উৎপত্তি, যেমন মানুষ একটি মূল শব্দ। মানুষ সম্বন্ধীয় যত কিছু কার্য, কারণ, গুণ প্রভৃতি সমস্ত শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অভিধানগুলিতে সমস্ত শব্দ বিভাগে সাজানো। সুতরাং অভিধান থেকে কথা খুঁজে বের করতে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় না। তারপর সাধারণ কার্যের উপযোগী জ্ঞানলাভ করতে হলে দু'হাজার কথা শিখলেই চলে। পাঁচ হাজার শিখলে পণ্ডিত হওয়া যায় এবং দশ হাজার শিখতে পারলে কোনো ভাবনাই থাকে না। সুতরাং চীনা ভাষা শিক্ষার্থীর বিশেষ ভয় পাবার কারণ নেই। দু'বছর চেষ্টা করলেই দু'হাজার কথা আয়ত্ত করা যায়।

চীনাদের সাহিত্য একটা বড় সাহিত্য। সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত হয় খৃষ্টের প্রায় হাজার বছর পূর্বে। তারপর এই তিন হাজার বছর ধরে সেই সাহিত্যের উন্নতি চলেছে। ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, কথা, ইতিহাস, অভিধান, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু জিনিস এই সাহিত্যকে বিপুল করে তুলেছে।

এখন প্রাচীন যুগের ধর্মগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে দু'এক কথা আলোচনা করা যাক। কারণ সেইগুলিই চীনাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে বহুদিন ধরে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। এই ধর্মশাস্ত্র তিন শ্রেণীয়। কনফুসীয়, 'তাও' সম্বন্ধীয় ও বৌদ্ধ।

কনফুসীয় সাহিত্যই চীনাদের প্রধান শাস্ত্র। কনফুসীয়স্ চীনাদের একজন মহাপুরুষ। এঁর মূল নাম হচ্ছে কোং-ফু-চ অর্থাৎ দার্শনিক কোং ইউরোপী ভাষায় এই চীনানাম রূপান্তরিত হয়ে কনফুসীয় আকার ধারণ করেছে। কোং-ফু-চ প্রায় বুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁর জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৫৫১ এবং মৃত্যুকাল খৃঃ পূঃ ৬৭৯। তিনি শান-টং অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমে কিছুদিন রাজকীয় কাজে নিযুক্ত থেকে দেশের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হন ; দেশে অরাজকতা, রাজার আধিপত্য তখন নামমাত্র, সামাজিক জীবনেও তখন অবনতি দেখা দিয়েছে। দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। তাই কনফুসীয়স্ রাজকীয় পদ ত্যাগ করে দেশভ্রমণে বেরুলেন। বহুদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করে তিনি বুঝলেন যে দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা প্রয়োজন, যে-ধর্মকে অবলম্বন করে চীন জাতি বড় হয়ে উঠেছিল, সেই ধর্মকে পুনরায় প্রচার করা আবশ্যক, এই প্রচারকল্পে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের কয়েকখানি লুপ্তরত্ন উদ্ধার করে সেগুলিকে প্রকাশ করলেন। এই শাস্ত্রগ্রন্থই পাঁচখানি। (১) সু-চিং প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্র। চীনজাতির প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিবৃত্ত এই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম রাজা থেকে আরম্ভ করে চৌবংশ পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৮ম শতক) চীন দেশের কীর্তিকলাপ এতে বর্ণিত হয়েছে। (২) শিং-চিং কাব্যগ্রন্থ। বহু প্রাচীন কালের অনেক কবিতা এতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩০৫টি কবিতা আছে। আমাদের বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে এগুলির তুলনা হতে পারে। বৈদিক মন্ত্রের ন্যায়ই এগুলি প্রথমে মুখে-মুখে চলতো। কনফুসীয়স্ সেগুলিকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। কনফুসীয়স্ নিজে এই দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর শিষ্যেরা পরবর্তী কালে আর বাকি তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে তিনখানিও খুব প্রাচীন—চৌবংশের রাজ্যকালে লেখা। (৩) ই-চিং অর্থাৎ পরিবর্তন শাস্ত্র। এতে চীনাদের দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায়। (৪) লি-চি হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র। ৫) ছুয়েন-ছু বসন্ত ও শরৎকালের ইতিবৃত্ত। এ-গ্রন্থখানি কনফুসীয়সের নিজের লেখা। তিনি নিজে যে-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, এই গ্রন্থে সেই প্রদেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে। এই পাঁচখানি প্রাচীন গ্রন্থ না পড়লে চীনারা নিজেদের পণ্ডিত বিবেচনা করেন না। এ-পাঁচখানি গ্রন্থের ওপর বহু টীকা, টিপ্পনী লেখা হয়েছে। এইসমস্ত সাহিত্যকে কনফুসীয় শাস্ত্র বলা হয়। এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হলে কোনো লোক রাজকীয় পদে নিযুক্ত হ'ত না। রামায়ণ মহাভারত না পড়লে যেমন প্রকৃত হিন্দু হয় না, কনফুসীর শাস্ত্র না পড়লেও তেমনি কোন চীনা প্রকৃত চীনা হয় না। তাই কনফুসীয় শাস্ত্রই হচ্ছে চীন সভ্যতার মেরুদণ্ড। কনফুসীয়স্ কোনো ধর্মমত বা দর্শন প্রচার করেন নি। নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের

শাস্ত্রসম্মত কর্তব্যগুলিই তিনি প্রত্যেক স্বদেশবাসীকে প্রতিপালন করতে বলেছেন। রাষ্ট্র হচ্ছে একটা বড় পরিবার। বহু ক্ষুদ্র পরিবারের সমষ্টি দিয়ে এই বৃহত্তর পরিবার তৈরি হয়েছে। সাধারণ পরিবারে পুত্রকে পিতৃভক্ত হতে হবে ও অন্যান্য পূজনীয়দের যথাযোগ্য সম্মান করতে হবে। প্রতিবেশীর যত্ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষে হচ্ছেন সম্রাট নিজে। তিনি হচ্ছেন এই বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয়। তিনি নিজে হচ্ছেন দেবপুত্র অর্থাৎ দেবতা কর্তৃক নিয়োজিত। সেই রাষ্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় পিতা, তাই প্রত্যেক পুত্র বা প্রজার সম্মান নেই। কনফুসীয়সের সমস্ত ধর্মমতই এই জাতীয়। রাষ্ট্র ও সমাজকে এক সূত্রে না বাঁধতে পারলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয় এ-কথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই সেই দুটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই তাঁর সমস্ত চেষ্টা। চীনজাতির সমস্ত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি এ-বিষয়ে আশাতীতভাবে কৃতকার্য হয়েছেন।

প্রাচীন চীনশাস্ত্রের দ্বিতীয় শাখা হ'ল 'তা-ও' শাস্ত্র। 'তাও' ধর্মের প্রচারক হচ্ছেন আর-একজন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ 'লাও', তিনি কনফুসীয়সের কিছু পূর্ববর্তী, প্রায় সমসাময়িক বললেও চলে। তিনি ছিলেন এক দার্শনিক মতের প্রবর্তক। ইঁন একখানি ছোট গ্রন্থ লিখেছিলেন—তার নাম তাও-তে-চিং। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকে অবলম্বন করে প্রায় দেড় হাজার টীকা টিপ্পনী লেখা হয়েছে। লাও-জু কনফুসীয়সের মতো সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারক ছিলেন না। তাই তার ধর্মমত একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডিতেই আবদ্ধ আছে। কোনো দিন তা সমস্ত চীন জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। 'তা-ও' কথার অর্থ হচ্ছে পথ বা মার্গ। 'তে' কথার অর্থ পুণ্য। তাও-তে-চিং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের 'মার্গ' নির্দেশ করেছে। লাও-জু যে-পথ নির্দেশ করেছেন সেটা ভারতীয় যোগমার্গের তুল্য। তাই অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতীয় ধর্মের প্রভাবেই লাও জুর ধর্মমত গড়ে উঠেছে। সে-কথা এখনও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কারণ অত প্রাচীন কালে ভারতের সঙ্গে চীনদেশের যে কোনো সম্বন্ধ ছিল এ কথা এখনও প্রমাণিত হয় নি। যাহোক তাও-তে-চিং গ্রন্থের কথা ভারতবর্ষের কেউ-কেউ জানতেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়ান-চাং যখন হর্ষবর্ধনের রাজ্য ছেড়ে কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন, তখন কামরূপের রাজা কুমার ভাস্কর বর্মন হিউয়ান-চাংকে চীন দেশের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন। এবং তাও-তে-চিং গ্রন্থের একখানি সংস্কৃত অনুবাদ তাঁকে পাঠাতে অনুরোধ করেন। হিউয়ান-চাং স্বদেশে ফিরে গিয়ে অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে এই অনুবাদ যে করেছিলেন, সে-খবর আমরা জানি। 'তাও' শব্দ অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁরা 'মার্গ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অনূদিত গ্রন্থের আর কোনো খবর আমরা পাই না।

এইবার বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা শুনিয়েই শেষ করবো। পূর্বেই বলেছি যে, চীনদেশে খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সুরু হয়। এই প্রচার কার্য প্রায় আড়াই হাজার বছরের ওপর ধরে চলেছিল। এই হাজার বছরের ইতিহাস ভারতের গৌরব কাহিনীই প্রচার করেছে। এই যুগে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন।

আজ তাঁর কীর্তিকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করবো। তাঁদের সাহায্যে চীনদেশের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করা আরম্ভ করেন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনে ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। ভারতীয় পণ্ডিতেরাও অবশ্য চীন দেশে গিয়ে চীনা ভাষা অধ্যয়ন করতেন। হাজার

বছর ধরে যে বৌদ্ধসাহিত্য চীনা ভাষায় অনূদিত হয় তা বিপুল। প্রায় পাঁচ হাজার সংস্কৃত গ্রন্থ এই সময়ে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। তার ভিতর দু'হাজার গ্রন্থের ওপর এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষ থেকে চিরদিনের মতো লোপ পেয়েছে। শুধু চীন দেশই সেগুলিকে অনুবাদ করে রক্ষা করেছে। চীনজাতির জীবনের ওপর বৌদ্ধধর্মের বহু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একসময়ে চীনসম্রাটেরাও এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। চীনদেশে যে-সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তার অনেক আজও বর্তমান আছে। বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ চীন দেশকে অনেক জিনিস দিয়েছে। ভারতীয়দের শিক্ষার গুণেই চীন স্থপতিবিদ্যা, সুকুমার-শিল্প, ভাস্কর্য, শব্দশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে-উন্নতিসাধন করেছিল তা চীনদের বর্তমান জীবন আলোচনা করলেও চোখে পড়ে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীন চীনজাতির সঙ্গে বহুদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাতে তাঁদের গৌরবও কীর্তিত হচ্ছে। আমরা নিজেরাও যে গৌরবান্বিত হচ্ছি এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁরা হাজার বছর ধরে যা করেছিলেন আমরা পরবর্তী সাতশো বছর ধরে তা ভুলেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহুদিন ধরে চীনদের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু আমরা তার কোনো চেষ্টাই করি নি। বরং চীনদের ওপর আমাদের ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সূত্র হ'তে দেশের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে চীন দেশের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের কোনো চেষ্টা হয় নি। চীন ভারতবর্ষের কথা এখনও ভোলে নি। প্রাচীন মৈত্রীর কথা তার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতের সমস্ত সাহিত্য ঘাঁটলেও চীনজাতির সম্বন্ধে একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্বর জাতির সঙ্গে তাদের নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা আমাদের নেই। এ-অপবাদ কাটাতে হলে চীনাদের খবর আমাদের নিতেই হবে। তাঁদের সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে ও মৈত্রীর সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন করতে হবে।

ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুর্নুফ

ইউজেন বুর্নুফ (Eugene Burnouf) বিখ্যাত ফরাসী ওরিয়েণ্টালিস্ট বা প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বিগত শতকের প্রথম ভাগে তাঁর নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাচীন ইরানীয় ধর্মশাস্ত্র আবেস্তা, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র, এবং পুরাণ প্রভৃতির গভীর আলোচনার দ্বারা তিনি প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনায় যে পথ প্রবর্তন করেন তাই ওরিয়েণ্টালিস্টগণ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন। বুর্নুফের পাণ্ডিত্যের সঠিক পরিচয় দিতে গেলে তাঁর পূর্বে ইউরোপে সংস্কৃত বা আবেস্তার আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা জানবার দরকার।

ইউরোপে সংস্কৃত আলোচনার সূত্রপাত ঠিক কখন হয় সে-সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। সাধারণত মনে করা হয় যে ইংরাজ পণ্ডিতদের চেষ্টায় ইউরোপে এ-আলোচনা সুরু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের পরামর্শে উইল্‌কিন্স নামক একজন পণ্ডিত কাশীতে পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভাগবদ্‌গীতা ও হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রায় এই সময়েই উইলিয়ম জোন্স কলকাতায় 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃত আলোচনা ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হয়। কেরি এবং উইল্‌কিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর অনেক পূর্বেই সংস্কৃত ভাষার আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল, তার নূতন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পঁ (Pons) নামক একজন ফরাসী ধর্মযাজক ভারতবর্ষ হতে দেশে যে চিঠি লেখেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই চিঠিতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং সে-সাহিত্যের বেদ, দর্শন, ন্যায়, ব্যাকরণ, অলংকার অভিধান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাখার উল্লেখ করেন। প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা সে-যুগের যে-কোনো জ্ঞান-পিপাসুকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। উপরন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সবচাইতে সম্পদ্‌শালী ভাষা (la plus riche langue du monde) বলে উল্লেখ করেন। উইলিয়ম জোন্স ভারতবর্ষে আসবার সময় এ-চিঠি দেখতে পান এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন।

পঁ সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে শুধু চিঠি লিখেই যে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন। এই ব্যাকরণের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-ব্যাকরণ লিখিত হয়েছিল ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং লাতিন ভাষায়—

Grammatica Sanscritica cui adjonctum est Dictionarium Sanscriticum *Amarakocha* inscriptum.

অর্থাৎ "সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তৎসঙ্গে লিখিত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ"। এই ব্যাকরণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—(১) বর্ণমালা, (২) সর্বনাম, (৩) শব্দরূপ, (৪) ধাতুরূপ, (৫) ধাতুকোষ (অসম্পূর্ণ)। এ ছাড়া চাণক্যসার-সংগ্রহের শ্লোক ও লাতিন অনুবাদসহ অমরকোষ এ-গ্রন্থে

সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশেষে গণপাঠ ও বোপদেবের কাব্যকামধেনু রয়েছে। পঁ এ-গ্রন্থ রচনা করেন চন্দননগরে এবং সেই কারণে তিনি দেবনাগরীর পরিবর্তে বাঙলা অক্ষর ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ-ব্যাকরণ ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার হতে রচিত এ-কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

এই ব্যাকরণ যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা আলোচনায় সহায়তা করে নি এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপে ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় সর্বাগ্রে প্যারিসে। কলেজ দ' ফ্রাঁসে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। আর প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন শেজি (Chezy)। শেজি এ-পদে নিযুক্ত হবার পূর্বেই সংস্কৃত আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। এ-কার্যে তাঁর একমাত্র পথ প্রদর্শক ছিল—পঁ-এর ব্যাকরণ।

শেজি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নানা ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল বলে তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 'ওরিয়েণ্টালিস্ট' হিসাবে সরকারী দপ্তরে কাজ করবার অনুমতি পান। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী ওরিয়েণ্টালিস্টের পদ পান ও Bibliotheque Nationale বা রাজকীয় পুস্তকাগারে মিশর দেশ হতে নেপোলিয়ন যে-সব পুঁথিপত্র আনেন সেগুলি সংরক্ষণ করবার ভার পান। এই সময়ে রাজকীয় পুস্তকালয় হতে তিনি পঁ-এর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি বের করেন ও তার সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগত কারণে এ-শিক্ষার কথা তাঁকে অনেকদিন গোপন রাখতে হয়, কিন্তু উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ বেরুতেই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি সে-বইয়ের যে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন, তা হতেই সকলে বুঝতে পারে যে তিনি ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতনবীশ। এর কয়েক বৎসর পরেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন বিতাড়িত হন, এবং প্রাচীন রাজবংশ আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কলেজ দ' ফ্রাঁসে তখন নাম ছিল College Royale de France) দুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। একটি হচ্ছে চীন এবং মাঞ্চু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য, অন্যটি সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য। প্রথম পদে নিযুক্ত হন আবেল রেমুজা (Abel Remusat), এবং দ্বিতীয় পদে শেজি। শেজির ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়, তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখময় এবং সেই কারণে তিনি তাঁর অনেক রচনা প্রকাশ করতে পারেন নি। সেইজন্যই তাঁর শেষের রচনা অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদের প্রথম পত্রে তিনি স্কট থেকে এক লাইন উদ্ধৃত করে মনের কথা ব্যক্ত করে যান—

That I o'erlive such woes,
Enchanteress ! is thine own.

শেজি নিজের চেষ্টায় যে-শিক্ষার প্রবর্তন করেন সে-শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় তাঁর ছাত্র বুর্নুফের (Eugene Burnouf) হাতে। বুর্নুফ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হতে নিজেই সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং তাঁর পিতার নির্দেশ-ক্রমেই বুর্নুফ অন্যান্য শিক্ষা শেষ করেই শেজির নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জার্মানীতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তক লাসেন (Lassen) ছিলেন বুর্নুফের সহপাঠী ও সহকর্মী। উভয়ে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে Essai sur Pali নামক প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

পালি ভাষা সম্বন্ধে সে-সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কোনো জ্ঞানই ছিল না, সুতরাং অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ-গ্রন্থ ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেক সহায়তা করেছিল।

বুর্নুফের দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী প্রখর এবং সেই কারণে তিনি প্রথম থেকেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখতে পেরেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে Ecole normale নামক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েই তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সেই প্রথম সূত্রপাত। বুর্নুফের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে তিনি এই সময়েই লাতিন, গ্রীক, সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষার তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করেছিলেন (les principes generaux d'une theorie philosophique du langage)।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শেজির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বুর্নুফ কলেজ দ' ফ্রাঁসে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেই এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—*Commentaire sur le Yasna*। যশ্ন হচ্ছে আবেস্তার অংশ বিশেষ। আবেস্তা ইতিপূর্বেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হস্তগত হয়েছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ভারতবর্ষ হতে আবেস্তা সংগ্রহ করে অক্সফোর্ডে নিয়ে আসেন, কিন্তু সে-গ্রন্থ পাঠ বা আলোচনা করবার চেষ্টা কেউ করেন নি। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আঁকতিল দুপেরোঁ এ-গ্রন্থের খোঁজ পান ও ভারতবর্ষে আসবার পর আবেস্তার অন্য পুঁথিও সংগ্রহ করেন। দুপেরোঁ পার্শি পুরোহিতদের সহায়তায় আবেস্তা অনুবাদ করেন, এবং দেশে ফিরবার পর সে-অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুপেরোঁর অনুবাদ সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও আবেস্তা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে কৌতূহল জাগিয়ে দেয়।

আবেস্তা নিয়ে বুর্নুফের আলোচনা ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের একটি স্মরণীয় কীর্তি। দুপেরোঁ যশ্নের যে-অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন বুর্নুফ সে-অনুবাদ সংশোধন করলেন, এ-কার্যে তিনি সবচাইতে বেশী সাহায্য পেলেন যশ্নের এক প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ হতে, নেরিওসেঙ্গ নামক পণ্ডিত পঞ্চদশ শতকে এ-অনুবাদ করেন। কিন্তু বুর্নুফের-এর চাইতেও বেশী মৌলিক কাজ হ'ল তাঁর টীকা-টিপ্পনী। তিনি তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রত্যেক শব্দের প্রকৃত অর্থ, ধাতুরূপ, ও প্রয়োগবিজ্ঞান সমস্তই নির্ণয় করলেন। তার এই কাজের দ্বারা যে ইউরোপে আবেস্তা আলোচনার পথ পরিষ্কার হ'ল শুধু তাই নয়, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হ'ল।

আবেস্তার অন্যান্য অংশের আলোচনাও বুর্নুফ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ১৮৪৯ হতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আবেস্তার আর-একটি প্রধান অংশ—বেন্দিদাদের আলোচনা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তাঁর পুঁথিপত্রের মধ্যে আবেস্তা সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা পাওয়া গিয়েছে। সমস্ত আবেস্তার একটি অভিধান প্রকাশ করবার জন্য তিনি সে-গ্রন্থের নানা অংশের সম্পূর্ণ শব্দসূচি প্রণয়ন করেছিলেন। শব্দসূচি সম্পূর্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু অভিধান তিনি শেষ করতে পারেন নি।

আবেস্তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তাঁর হাতে প্রথম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে-আলোচনা কাঁচা হাতের নয়। বহুকাল সে-আলোচনা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর প্রদর্শিত

পথ অনুসরণ করেই পরবর্তী পণ্ডিতেরা আবেস্তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এর পর বুর্নুফ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম কাজ—ভাগবত পুরাণের ফরাসী অনুবাদ। এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ থাকতে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করতে গেলেন কেন। এর কারণ, তাঁর ছাত্র ইতালীয় পণ্ডিত গোরেজিও (Gorrezio) রামায়ণের সংস্করণ ও অনুবাদ করছিলেন ; জার্মান পণ্ডিতদের ভিতর শ্লেগেল রোজেন (Rosen) (দ, এবং বপ (Bopp) মহাভারতের অনুবাদ করা মনস্থ করেছিলেন। সেইজন্য আর বুর্নুফ এসব গ্রন্থে হাত দেন নি।

বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে বুর্নুফ যে-আলোচনা আরম্ভ করেন তা এখনো আমাদের সমাদরের যোগ্য। বৌদ্ধসাহিত্যের কোনো মৌলিক গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয় নি। নেপাল হতে হজসন অনেক পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে প্যারিস ও লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন। চীনা বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে রেমুজা (Remusat), মঙ্গোলীয় নিয়ে শ্মিড্ (Schmidt) এবং তিব্বতী নিয়ে কোরোস্ (Csoma de Koros) কিছু-কিছু আলোচনা করেছিলেন মাত্র। বুর্নুফ হজসনের প্রেরিত পুঁথিপত্র অবলম্বন করে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার নাম—*Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien*। এ-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এ-বই সর্বপ্রথম গ্রন্থ হ'লেও তার মধ্যে বুর্নুফের যে পাণ্ডিত্য ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি অসম্পূর্ণ পুঁথিপত্র হতেই বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ধারণা করতে পেরেছিলেন, এবং সেই কারণে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের সঙ্গে চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, মাণ্ডু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের যথাসম্ভব তুলনা করে সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। প্রায় এক শতাব্দী অতীত হতে চলেছে, ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোচনা হয়েছে, অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্য পণ্ডিতদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বুর্নুফের এ-বই এখনো তার প্রয়োজনীয়তা হারায় নি। বরং অনেক বিষয়ে সে-বই এখনো একমাত্র বই।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বুর্নুফের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আর-একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখানি মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের ফরাসী অনুবাদ—*La Lotus de la Bonne Loi*। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একখানি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ। বুর্নুফের সময় এ-গ্রন্থের কোনো মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। নেপাল হতে হজসনের প্রেরিত পুঁথি অবলম্বন করে এ-অনুবাদ করা হয়। এ-অনুবাদের মূল্য এতদিন পরেও কমে নি। এ-অনুবাদের শেষে বুর্নুফ পারিভাষিক ও বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর যেসব টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত করেছিলেন তার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই-সব টীকা-টিপ্পনী সমেত বুর্নুফের অনুবাদ এখনো আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

এ ছাড়া বুর্নুফের কাগজপত্রের মধ্যে অনেক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীন আসিরীয় শিলালেখের আলোচনা, পাণিনির ব্যাকরণের শব্দ-সূচি, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের লাতিন অনুবাদ। সম্পূর্ণ পালি ব্যাকরণ, অভিধানপ্পদীপিকা ও মহাবংশের লাতিন অনুবাদ, এবং নানা জাতকের অনুবাদ ও আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক আঁতোয়ান্ মেইয়ে ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব

কিছুকাল আগে প্যারিসের কলেজ দ'ফ্রান্সের বিখ্যাত অধ্যাপক আঁতোয়ান্ মেইয়ের (Antoine Meillet) তিরোধান হয়েছে। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দ'ফ্রান্সের অধ্যাপনা করেছেন। হয়তো তাঁর নাম আমরা খুব কম শুনেছি, তার কারণ তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন নি। তাঁর কর্মজীবন এমন একটা বিষয়ের অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়েছিল যার আলোচনা এ-দেশে এখনো সুরু হয় নি বললেই চলে। সে-বিষয় হচ্ছে Indo-European linguistics অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। এই ভাষাতত্ত্বকে যাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোঠায় তুলেছেন তাঁদের মধ্যে মেইয়ে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

মেইয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে মুখবন্ধ হিসাবে কিছু না বললে চলে না। কারণ যে-বিজ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন সে-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। অনবধানতাবশত আমরা philology ও linguistics অনেক সময় একই অর্থে প্রয়োগ করি, অথচ এই দুই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ নির্দেশে প্রযুক্ত হয়। 'ফিললজি' হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো বিশেষ ভাষার, শব্দ-প্রয়োগ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণ প্রভৃতি উদ্ধার করা। তাই ফিললজিস্ট কোনো বিশেষ ভাষার আভ্যন্তরিক ঘটনাবলীকে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র। অপরপক্ষে 'লিংগুই-স্টিক্স'-এর উদ্দেশ্য হ'ল নানাভাষার ঘটনাবলীর তুলনামূলক বিচার করা। সুতরাং একটি হচ্ছে কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব, অন্যটি হচ্ছে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। যাঁরা linguistics চর্চা করেন তাদের ফরাসী ভাষায় linguiste বলা হ'লেও ইংরাজীতে linguist বলা চলে না, কারণ ইংরাজী ভাষায় ও-কথার অর্থ হচ্ছে 'ভাষাজ্ঞ'; সেই কারণে ইংরাজী ভাষায় তাঁদের linguistician আখ্যা দেবার কথা হচ্ছে।

অধ্যাপক মেইয়ে মুখ্যত linguistician হ'লেও প্রকৃত ছিলেন উভয়-পদবাচ্য। তিনি যখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করেন তখন সেই ভাষা-গোষ্ঠীর অনেক ভাষার ভাষাতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয় নি—যেমন, প্রাচীন পারসিক, আর্মেনীয়, রুশীয় প্রভৃতি ভাষা। সুতরাং এসব ভাষার আলোচনাও তাঁকে philologist হিসাবে করতে হয়েছিল, কারণ সে-আলোচনা না হ'লে ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এ-কথা সত্য যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চা সুরু হতেই পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন যে গ্রীক্, লাতিন, জার্মানিক্, প্রভৃতি ও সংস্কৃত একই প্রাচীন ভাষার নানা শাখা, এবং এ-কথাও সত্য, সংস্কৃত ভাষার নানা প্রাচীন ব্যাকরণের সাহায্য না পেলে হয়তো বহুদিন ধরে

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান গড়ে উঠতো না। তার কারণ প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা বর্তমান কালেও প্রশংসনীয়। তাঁরা প্রথমত সংস্কৃত ভাষার নানা বর্ণের উচ্চারণের যথাযথরূপে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন, এবং তাদের ক্রমবিবর্তনের না হ'লেও পরিবর্তনের কারণও যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া এখন যাকে morphology (শব্দের রূপতত্ত্ব) বলা হয় সেদিক দিয়েও সংস্কৃত ভাষার বিচার তাঁরা সুসংগতভাবে করেছিলেন এবং সেই কারণে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হতেই সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের পন্থানুসরণ করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর নানা ভাষার আলোচনা সুরু হ'ল। কিন্তু তাই বলে বর্তমান কালের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব যে ভারতীয় বৈয়াকরণিকদের দান একথা মনে করা সম্পূর্ণ অসংগত হবে। সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় তাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে-ভাষাকে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন স্থাণু. কোনো ভাষার যে ক্রমবিবর্তন হতে পারে এবং সেই বিবর্তনের ফলে যে ভাষার নূতন নূতন রূপ জন্ম গ্রহণ করে, এ-ধারণা তাঁদের আদৌ ছিল না; সে-ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যুগের অবদান।

বর্তমান যুগে এ-বিজ্ঞানের জন্ম যে জার্মানীতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করেন সর্বপ্রথমে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত বোপ (Franz Bopp)। তিনি প্রাচ্য দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনার জন্য কিছুকাল প্যারিসে অবস্থান করেন এবং সেই সময়েই সামান্য পুঁথিপত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ইতিপূর্বেই হয়েছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পাদ্রি ক'রদু (Cœurdoux) এবং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স ও প্রায় সেই সময়েই জার্মান ধর্মযাজক সেণ্ট বার্থেলেমি (Saint Berthelemy) সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ও জার্মানিকের জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে সে কথা স্পষ্ট করে বলেন এবং এই তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃত ভাষা হতে কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সে-সম্বন্ধে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল (Schlegel) পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোপ প্যারিস হতে দেশে ফিরে গিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন, পারসিক ও জার্মান ভাষার ধাতুরূপের তুলনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ ও পরবর্তী নানা গ্রন্থে একই প্রণালী অনুসৃত হয়। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই তুলনা করে ধাতুর প্রাচীন রূপ নির্ধারণ করা। এই কারণে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেন নি। কোন্-কোন্ নিয়মানুসারে ভাষার উচ্চারণমূলক পরিবর্তন (phonetic evolution) ঘটে কিংবা শব্দের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বা বাক্যের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে কোনো আলোচনাই নেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর উচ্চারণমূলক পরিবর্তন আলোচনা সুরু হ'ল যাঁদের হাতে তাঁরা কেউই সংস্কৃত জানতেন না। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জাতিতে দিনেমার, নাম রাস্ক (Rask), অন্যজন হচ্ছেন জার্মান, নাম গ্রীম (Grimm)। রাস্ক ও গ্রীম উভয়েই ছিলেন philologist, উভয়েই প্রাচীন জর্মানিক ভাষার ব্যাকরণ গভীরভাবে আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল, শব্দের প্রাচীন রূপ খুঁজে বের করবার বৃথা

চেষ্টা নয়, প্রত্যেক শব্দ কি কি রূপে নানা জর্মানিক ভাষায় বর্তমান রয়েছে তা নির্ধারণ করা এবং প্রাচীন ভাষাসমূহ, অর্থাৎ গ্রীক লাতিনে, তাদের প্রাচীন রূপ পাওয়া গেলে যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে তুলনা করা। এই কারণে রাস্ক ও গ্রীমের কাজ হয়েছিল বোপের কাজের চাইতে বেশী বিজ্ঞানসম্মত। রাস্ক ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করলেন যে গ্রীক লাতিন, প্রাচীন জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রধান ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ধ্বনি-বিজ্ঞানের বিশেষ নিয়মাবলী অনুসারে সামান্য রূপ পরিবর্তন করেছে, যথা, জার্মান p, t, k,— লাতিন b, d, g, কিংবা গ্রীক b' c' g' ইত্যাদি। রাস্কের এই সিদ্ধান্তানুসারে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গ্রীম এ-বিষয়ে পুনরালোচনা করেন ও ধ্বনি-তত্ত্বে (phonetic) ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তনের নিয়মাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ-আবিষ্কার মূলত রাস্ক করলেও গ্রীমের নামেই Grimm's Law হিসাবে তা চলে আসছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা বোপের পরে, কুন (Kuhn), শ্লাইখের (Schleicher) প্রভৃতি নানা পণ্ডিতের হাতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, কিন্তু সে-আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোঠায় উন্নীত হ'ল আরো পরে। এ-বিলম্বের প্রধান কারণ ছিল নানা প্রাচীন ভাষার philological studies-এর অভাব। বিগত শতকের মধ্যভাগে নানা পণ্ডিতদের হাতে বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার philology সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল — ফ্রান্সে বুর্নুফ আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক শিলালিপির গভীর আলোচনা করলেন, এবং প্রাচীন ইরানীয় ভাষার তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান গড়ে তুললেন। এই সময়ে জার্মানীতে নানা পণ্ডিত গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও রুশদেশে রুশীয় পণ্ডিতেরা শ্লাভনিক ভাষার ভাষাতত্ত্বের সুসংগত আলোচনা করলেন এবং এইসব আলোচনার ফলে Indo-European linguistics সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ ও তাদের ক্রমপরিণতির ধারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হ'ল। কিন্তু কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে (phonology) ব্যঞ্জনের চাইতে স্বরবর্ণের স্থান নির্ধারণ করাই হচ্ছে বেশী আবশ্যকীয়; সে-আলোচনা এইবার আরম্ভ হ'ল এবং ফরাসী পণ্ডিত দ'সসুর (De Saussure) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরবর্ণসমূহ ও তাদের ক্রমপরিণতির ধারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করলেন। দ'সসুরের পূর্বে এ-সম্বন্ধে যে কেউ না ভেবেছিলেন তা নয়, তবে তাঁরা এ-সম্বন্ধে কেউই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি; দ'সসুর তা পৌঁছেছিলেন। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরবর্ণের রূপ নির্ধারিত হতেই ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষার তুলনামূলক বিচার সহজসাধ্য হ'ল এবং সে-সম্বন্ধে ধারাবাহিক কাজ সুরু হ'ল। এ-কাজে অগ্রণী হলেন ব্রুগমান্ Brugmann ও তাঁর সহকর্মী দেলব্রুক (Delbruck) এবং তাঁদের হাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ গড়ে উঠলো। এই সময়ে মেইয়ের আবির্ভাব।

॥ দুই ॥

অধ্যাপক মেইয়ে ছিলেন দ'সসুরের ছাত্র; তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন অধ্যাপক লেভির নিকট এবং সেই হিসাবে তিনি লেভিরও ছাত্র। অধ্যাপক মেইয়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। পূর্বেই বলেছি যে তিনি ছিলেন একাধারে philologist ও linguistician।

তাঁকে philologist হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল ; তার কারণ অনেক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তখনো বাকি ছিল। সেই দিকে মেইয়ের দৃষ্টি প্রথম পড়ে ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর যে প্রথম বই প্রকাশিত হয়— সে-বইয়ের নাম ***Recherches sur l'emploi du genitif-accusatif en vieux slave***, অর্থাৎ 'প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষায় সম্বন্ধ ও কর্মকারকের প্রয়োগ'। যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের ছায়া মাড়ান নি তাঁরা হয়তো ভাববেন যে কোনো ভাষায় এ দুটি কারকের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, প্রশংসারও বস্তুও নয়। কিন্তু সে-মতবাদে আমাদের আস্থা স্থাপন করা সংগত হবে না। ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, কোনো ভাষার morphology বা শব্দের রূপতত্ত্বে সম্বন্ধ ও কর্মকারকের ব্যবহারই বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য, কারণ সে-ব্যবহাবের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারলে সমস্ত morphology বোঝা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর প্রাচীন শ্লাভনিক বলতে আমরা এমন একটা ভাষা বুঝি যার প্রচলন ছিল খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বে। এ-ভাষায় লিখিত খৃষ্টীয় নবম শতকের ধর্মশাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এবং সেইসব শাস্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন ভাষার রূপ কতক পরিমাণে ধরা যায়। কিন্তু তার সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে হ'লে ঐ ভাষাগোষ্ঠীর আধুনিক নানাভাষার তুলনামূলক বিচার করা আবশ্যক।

শ্লাভনিক ভাষাগোষ্ঠী বর্তমানে ত্রিধাবিভক্ত —(১) দক্ষিণ-প্রবাহ—(ক) মাকিদনীয় ও বুলগার (Macedonian, Bulgarian), নবম শতকে এই ভাষায় খৃস্টধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ অনূদিত হয় এবং সেসব অনুবাদ খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পুঁথিতে সংরক্ষিত হয়েছে। (খ ক্রোয়াত (Serbo-croatian) বর্তমান যুগোশ্লাভ প্রদেশে নিবদ্ধ। (গ) শ্লোভান (Sloven), এ-ভাষা হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের কথ্য ভাষা এবং তা ইতালী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের নানাস্থানে নিবদ্ধ। (২) পশ্চিম-প্রবাহ—শ্লাভনিক ভাষাগোষ্ঠীব পশ্চিম-প্রবাহের প্রধান ভাষা হচ্ছে—পোলিশ ও চেক্ (Polish ও Czech) বর্তমানে পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাষা। (৩) মূল প্রবাহ—রুশীয় ভাষা। সুতরাং ত্রিধা বিভক্ত হবাব পূর্বে প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার স্বরূপ কি ছিল এবং সে-ভাষায় 'সম্বন্ধ ও কর্মকারকের ব্যবহার' কি প্রকার ছিল তা নির্ধারণ করতে হ'লে কেবলমাত্র খৃষ্টীয় নবম শতকের পুঁথির সাহায্য নিলেই চলবে না, কারণ সে-পুঁথির ভাষা হচ্ছে যাকে দক্ষিণ-প্রবাহ বলেছি ; অন্যান্য প্রদেশের নানা ভাষারও সাহায্য নিতে হবে। অধ্যাপক মেইয়েকেও তাই করতে হয়েছে। প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার এ-আলোচনা তিনি নানা কাজের মধ্যে বরাবরই চালিয়েছিলেন ; ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর Etudes sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux-slave, (প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষায় শব্দ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়), ১৯২২ খৃষ্টাব্দে Grammaire de la langue polonaise (পোলিশ ভাষার ব্যাকরণ) এবং পরিশেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে Le slave commun (সাধারণ শ্লাভনিক)। প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কাজের পরিসমাপ্তি হয়েছে এই শেষ গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থে ত্রিধা-বিভক্ত হবার পূর্বে প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার যে রূপ ছিল তার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার প্রাচীন ধ্বনিবিজ্ঞান phonology), ব্যাকরণ ও শব্দের রূপতত্ত্ব (morphology) বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার স্বরূপ নির্ধারণেই মেইয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নিবদ্ধ ছিল না। তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষার তুলনামূলক আলোচনাও বহুপূর্বেই আরম্ভ করেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ – *De quelques innovations de la declinaison latine* (লাতিন ভাষার শব্দরূপের কতকগুলি নূতনত্ব) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে *Apercu d'une histoire de la langue grecque* (গ্রীক ভাষার ইতিহাসের প্রথম খসড়া) প্রকাশিত হয়। গ্রীক-লাতিনের তুলনামূলক বিচারের পরিসমাপ্তি হয় এক বিরাট গ্রন্থে— *Grammaire comparée des langues classiques* (গ্রীক ও লাতিন ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ)। এ-গ্রন্থ তিনি তাঁর প্রধান ও প্রথম শিষ্য ভাঁদ্রিয়েসের (Vendryes) সহায়তায় শেষ করেন। শ্লাভনিক ও গ্রীক লাতিন ছাড়া তিনি ইউরোপের আর-একটি ভাষাগোষ্ঠীর আলোচনা করতেও পরাঙ্মুখ হন নি। সে-ভাষাগোষ্ঠী হচ্ছে জর্মানিক। এ-ভাষা নিয়ে বহু আলোচনা পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা করলেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে সে-সম্বন্ধে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল এবং সেই কারণে তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর *Caracteres généraux des langues germaniques* (জর্মানিক ভাষাসমূহের সাধারণ স্বরূপ) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে এশিয়ার নানা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে তিনি সংস্কৃত নিয়ে কোনো বিশেষ কাজ করেন নি সত্য (কারণ সেদিকে অনেক কর্মী ছিলেন), কিন্তু প্রাচীন ইরানীয়, পারসিক, আর্মেনীয় প্রভৃতির ভাষার আলোচনায় তিনি শীর্ষস্থানীয় হয়েছিলেন। প্রাচীন আর্মেনীয় (Aremenian) ভাষা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি, অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক আলোচনায় আর্মেনীয় ভাষাকে বাদ দেওয়া চলে না। কারণ এ-কথা ঠিক যে আর্মেনীয় ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষার উপশাখা নয় এ হচ্ছে একটা পৃথক শাখা। এ-ভাষার প্রাচীন কোনো নিদর্শন নেই; খৃষ্টীয় নবম শতকে এ-ভাষায় খৃষ্টধর্মের পুঁথিপত্র অনূদিত হয় আর সেই অনুবাদই হচ্ছে এ-ভাষার প্রধান প্রাচীন নিদর্শন। এইসব প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনিক আর্মেনীয় ভাষার সাহায্যে অধ্যাপক মেইয়ে তার প্রাচীন রূপ নির্ধারণ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর *Esquisse d une grammaire comparée de l'armenien classique* (প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ) এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে *Altarmenisches Elementarbuch* প্রকাশিত হয়।

আবেস্তা ও বিশেষভাবে আবেস্তার প্রাচীন অংশ গাথা নিয়ে মেইয়ের অনেক আলোচনা আছে। এ-সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা আছে—*Trois conferences sur les gàthà*। কিন্তু সে-আলোচনাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তিনি প্রাচীন পারসিক ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা করেন। প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ আমরা পাই না, কালক্রমে এ-ভাষা নানা শাখায় বিভক্ত হয়, যথা—জেন্দ (যে-ভাষায় আবেস্তা লিখিত), সুগ্দীয় (Sogdian)—সমরকন্দ অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা ও পহ্লবী— যা হতে ফার্সী ভাষার উৎপত্তি। প্রাচীন পারসিক হচ্ছে সেই ভাষা যা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে ইরানীয় সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের কথ্য ভাষা ছিল।

এই ভাষাতেই দরায়ুস (Darius), জারক্সেস (Xerxes) প্রভৃতি সম্রাটদের শিলালিপি

লিখিত হয়েছিল। এইসব উপাদানের সম্পূর্ণ আলোচনা না হ'লে প্রাচীন ইরানীয় ভাষার স্বরূপ নির্ধারিত হবে না। এ-কথা মেইয়ে বুঝেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর *Grammaire du Vieux Perse* (প্রাচীন পারসিক ভাষার ব্যাকরণ) প্রকাশ করেন। এবং তাঁরই নির্দেশানুসারে তাঁর একজন প্রধান শিষ্য গোথও (Gauthiot) মধ্য-এশিয়া হতে আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রের সাহায্যে প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করেন। গোথিওর সুগ্দীয় ব্যাকরণের প্রথম ভাগ মাত্র (Grammaire Sogdiane) প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে-কাজ সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ইউরোপের মহাযুদ্ধে তাঁর ডাক পড়ে ও তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। যুদ্ধে যোগদান করবার পূর্বে তিনি সমরকন্দ ও পামির অঞ্চলে প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার আধুনিক নানা শাখা-ভাষার আলোচনা করেছিলেন। মেইয়ের অন্য এক কৃতী ছাত্র বেনভেনিস্ত (Benveniste) সম্প্রতি গ্রোথিওর অসম্পূর্ণ গ্রন্থ শেষ করেছেন এবং মেইয়ের অনুপ্রেরণায় প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার তুলনামূলক সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এ-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, মেইয়ের ধারণা ছিল এইসব ইরানীয় ভাষার স্বরূপ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। শুধু আবেস্তার সাহায্যে সে-কাজ হতে পারে না, তার কারণ আবেস্তার ভাষা হচ্ছে প্রাচীন ইরানীয় ভাষার একটি শাখামাত্র। আর সে-ভাষাও যে-লিপিতে সংরক্ষিত হয়েছে সে-লিপিতে কোনো ভাষার নিজস্ব রূপ বজায় থাকতে পারে না ; কারণ সে-লিপিতে স্বরবর্ণ লিখবার কোনো উপায় নেই, লেখা চলে শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ। এই কারণে বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য ভাষার রূপ আমরা যত স্পষ্টভাবে ধরতে পারি, প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় তা পারি না।

পরিশেষে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে মেইয়ে আর-এক নূতন ভাষার আলোচনাও অতি দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। মধ্য-এশিয়া হ'তে পল পেলিও যে-সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে আনেন তন্মধ্যে কতকগুলি পুঁথি হতে লেভি এক নূতন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সন্ধান পান, তার উদ্ধার সাধন করেন ও অর্থনির্ণয় করেন। এ-ভাষাকে পূর্বে **Tokharian B** বলা হ'ত কিন্তু সম্প্রতি তার প্রকৃত নাম যে কুচীয় তা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়েছে। মেইয়ে এই ভাষার তুলনামূলক বিচার করে নানা প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে এ-ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি নূতন ভাষা, যা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে।

॥ তিন ॥

এ পর্যন্ত মেইয়ের যে-সমস্ত কাজের উল্লেখ করেছি তা হতেই সম্পূর্ণ বোঝা যাবে যে তাঁর প্রতিভা কতটা বহুমুখী ছিল। কিন্তু এসব বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গভীর আলোচনা করবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। এ-বইয়ের নাম হচ্ছে—*De indo-europea radice men 'mente agitare'* এবং এ-বইয়ে তিনি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় একটি মূল ধাতুর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বই এবং এক হিসাবে সে-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। এ-গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর প্রধান

কীর্তিস্তম্ভ। এ-বইয়ের নাম—*Introduction a l'ètude comparative des langues Indo-Europêennes*— অর্থাৎ 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের তুলনামূলক আলোচনার ভূমিকা।' পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের এবং মেইয়ের নিজের অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর এ-বই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের আলোচনার ভিতর অসংগত ও আনুমানিক যে-সব সিদ্ধান্ত ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন, এবং ইতিমধ্যে তাঁর নিজের ও অন্যের নানা নূতন অনুসন্ধানের ফলে নূতন নূতন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রসার লাভ করবার জন্য পূর্বে যেসব সিদ্ধান্ত ছিল হাল্কা সেগুলিকে তিনি বিজ্ঞানের কোঠায় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছেন।

ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্বরূপ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর হবে না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক বিচারে যে-সমস্ত ভাষার কথা ওঠে সেগুলি হচ্ছে—

(১) ইন্দো-ইরানীয়—ক বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এবং সে-ভাষা হতে উদ্ভূত মধ্যযুগের প্রাকৃত ভাষা ও আধুনিক ভাষা। (খ) ইরানীয়—আবেস্তার ভাষা, যাকে বলা হয় জেন্দ, পহ্লবী, পারসিক (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের শিলালিপির ভাষা), সুগ্দীয় ও পামির এবং ককেসাস পর্বতের অন্তঃপাতী নানা স্থানের কথ্য ভাষা।

(২ গ্রীক্—প্রাচীন গ্রীক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে যে-চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছিল তা ঐ-সময়ের নানা শিলালিপির ভাষা হতে জানা যায়; হোমারের কাব্য গ্রীক সাহিত্যের সবচাইতে প্রাচীন গ্রন্থ হ'লেও তার ভাষা অবিভক্ত গ্রীক ভাষার নিদর্শন নয়।

(৩) ইতালো-কেলতিক্ (Italo-celtic)—(ক) লাতিন, এবং ইতালীর অন্যান্য স্থানের প্রাচীন ভাষা. (খ) কেল্তিক্,—প্রাচীন গলদেশে, বৃটানী, কর্নওয়াল প্রভৃতি প্রদেশের ভাষা এবং আইরিশ।

(৪) জর্মানিক—এ-ভাষা বহু শাখায় বিভক্ত, এবং বর্তমান কালে জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, দেনমার্ক. হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত।

(৫) শ্লাভনিক ও বাল্তিক; শ্লাভনিক সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি; বাল্তিক হচ্ছে লিথুয়েনিয়ার ভাষা এবং প্রুশিয়া দেশে এ-ভাষা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে-দেশে তা অধুনালুপ্ত।

(৬) আলবানীয়

(৭) আর্মেনীয়

(৮) কুচীয়-তুখারীয় (এই নূতন আবিষ্কৃত ভাষাকে অনেকে ইতালো-কেল্তিকের অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও এর প্রকৃত স্থান এখনো নির্দিষ্ট হয় নি)।

এইসব ভাষা যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হতে উদ্ভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে সমজাতীয় শব্দ আছে বলেই যে এ-সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা নয়; তাদের প্রত্যেকের ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology), এবং শব্দের রূপতত্ত্বের (Morphology) পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেই এ-সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করা হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে আলোচনা করলে এসব ভাষাকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি ভাষায়

'একশত' বলতে আমরা সংস্কৃত 'শতম্'-জাতীয় শব্দ পাই (সংস্কৃত শতম্, জেন্দ সত'ম্, শ্লাভনিক সুতো, বাল্তিক শিম্তস ইত্যাদি) এবং অন্যান্য ভাষায় পাই কেন্তুম জাতীয় শব্দ (লাতিন্ কেন্তুম, কুচীয়-তুখারীয় কন্ত্, গেলিক কান্ত, গ্রীক-এ-খাতোন্ ইত্যাদি)। এ থেকে সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা কালক্রমে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, একটিকে বলতে পারি কেন্তুম-শাখা অন্যটি শত'ম শাখা। প্রথম শাখা হতে গ্রীক, ইতালো-কেল্তিক্ জর্মানিক, কুচীয়-তুখারীয় ইত্যাদি ; অন্য শাখা হতে শ্লাভনিক, ইন্দো-ইরানীয় প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েছে।

কেন্তুম ও শত'ম শাখার নানা ভাষার ক্রমবিবর্তন অনুসন্ধান করে ও তাদের তুলনামূলক বিচার করে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে-ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণসমূহের রূপ ধরা পড়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই এ-কথা স্পষ্ট ধরা পড়বে। সংস্কৃত শতম, জেন্দ-সত'ম্ শ্লাভনিক সুতো, বাল্তিক-শিম্তস্ ও লাতিন্, কেন্তুম কুচীয়-তুখারীয় কন্ত্ প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি তুলনা করলে বোঝা যায় এই শব্দসমূহের প্রথম ব্যঞ্জন আমরা বিভিন্নরূপে পাই, শ, স, ক ইত্যাদি। সুতরাং মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এ-স্থানে এমন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল যা শ, স, ক, এর কোনোটিই নয়। অথচ তা ছিল এমন একটি বর্ণ যা হতে শ, স, ক প্রভৃতি ব্যঞ্জন উদ্ভূত হয়েছে এবং সেই কারণে তার রূপ ধরা হ'ল k', এই জাতীয় তুলনার দ্বারা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমস্ত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের রূপ উদ্ধার করা হ'ল। এই ধ্বনিতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে যে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি পরবর্তীকালের কোনো ভাষাই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে নি, ক্রমবিবর্তনের ফলে নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তা বহুপরিমাণে বদলেছে। যথা, সংস্কৃতে আমরা স্বরের অ পাই. অথচ সেই 'অ'য়ের স্থানে, শ্লাভনিক ভাষায় e, o এবং আর্মেনীয়, ইতালো-কেল্তিক প্রভৃতি ভাষায় e, o, a পাই। এই তুলনায় স্পষ্ট ধরা যায় যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এমন তিনটি স্বরবর্ণ ছিল—*e, *o, *a যার প্রাচীন রূপ সংস্কৃতে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে মাত্র একটি স্বর অ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই একই প্রণালীতে নানা ভাষায় শব্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ তুলনা করে মূল-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার morphologyও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা ধাতুর রূপ তুলনা করলে আমরা প্রাচীন বিভক্তির রূপের খোঁজ পাই। যথা—তৃতীয় পুরুষ, বহুবচনে সংস্কৃত অভরন্ত, গ্রীক eponto, লাতিন sequo-ntu-r প্রভৃতি হতে বুঝতে পারি যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয়তে ধাতুর তৃতীয় পুরুষ বহুবচনে বিভক্তি ছিল -ento।

এ-সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার আবশ্যক নেই। পূর্বে যা বলেছি তা হতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানের নানা সমস্যার জটিলতা বোঝা যাবে। প্রাচীন ইতিহাসে এ-ভাষাবিজ্ঞানের অবদান তুচ্ছ নয়। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নানা শাখায় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধীয় যেসব সমজাতীয় শব্দ আছে সেগুলির তুলনা করলে আমরা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তার দ্বারা একটি প্রাচীন জাতির সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে না পারলেও বৈদিক যুগের সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত নানা অদ্ভুত মতবাদের ভ্রমপ্রমাদ সহজেই ধরতে পারি। এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রসার এবং সে-প্রসারের ধারা ও

কাল সম্বন্ধেও যে অনুমান করতে পারি সে-অনুমান কোনো দিন পরম সত্যে পরিণত না হলেও ব্যবহারিক সত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। এবং এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে এ-কথাও আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে বেদ খৃষ্টের জন্মের সত্তর হাজার কেন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও রচিত হয় নি। এই বিজ্ঞানের নানা দৃঢ় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের অনবধানতার জন্যই তথাকথিত পণ্ডিতসমাজে এখনো বহু হাস্যকর মতবাদ চলে আসছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আর-একটি শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান বা general linguistics সম্বন্ধে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির ও রূপের কি কি পরিবর্তন ঘটে সে-সম্বন্ধেও স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সেই ভাষা-গোষ্ঠীর বহু ভাষার তুলনা করতে হয়েছে এবং সেই কারণে general linguistics অনেক পরিমাণে লাভবান হয়েছে। এই দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যই মেইয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর *Linguistique historique et linguistique générale* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেইয়ের নানা প্রবন্ধের কথা এপর্যন্ত বলি নি, বলবারও প্রয়োজন নেই। যা বলেছি তা থেকেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভাষাতত্ত্ব ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে মেইয়ের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সিল্‌ভ্যাঁ লেভি

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি কিছুকাল পূর্বে কোনো-এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার সময় হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল প্রথমে সোরবোনে ও পরে কলেজ দ' ফ্রান্সে সংস্কৃতভাষা ও ভারতীয় কৃষ্টির অধ্যাপক ছিলেন। এ-দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় তিনবার ঘটেছিল— প্রথম ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য নেপালে কিছুকাল অতিবাহিত করেন, দ্বিতীয়বার ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে এক বৎসর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটি বক্তৃতা দেন, শেষবার ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপান হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মুখে এদেশে আসেন।

এ-দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী না হ'লেও লেভির নাম এ-দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট সুপরিচিত। তার কারণ তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আর যেসব ভারতীয়েরা হয় ফ্রান্সে না হয় এদেশে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু দেশের ছাত্র তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেছে— সেই শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ ছিল যার ফলে সকলেই তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়েছিল। লেভি ছিলেন স্বভাবকোমল ও স্নেহশীল—তিনি বিদেশী ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন ও সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন— যাতে প্রবাসের কষ্ট লঘু ও বিদেশ স্বদেশে পরিণত হ'ত। লেভির এই সস্নেহ ব্যবহারের জন্য শুধু যে ভারতীয় ছাত্রেরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত তা নয়, সুদূর জাপান, চীন, ইন্দোচীন জাভা, শ্যাম, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশের শিষ্যমণ্ডলীই তাঁকে এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে তাঁর বিদেশযাত্রায় বা কঠিন অসুস্থতায় সকলকেই বিচলিত হয়ে পড়তো। এই শিষ্যমণ্ডলীর জন্য লেভির দরজা সবসময় উন্মুক্ত থাকতো আর তা ছাড়া প্রতি শনিবারে তাঁর বাড়িতে তারা সকলে সমবেত হ'ত। যাঁরা লেভির প্রাচীন ছাত্র এবং যাঁদের ভিতর দু'একজন লেভির মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান (—ইউবের, লুই ফিনো…) তাঁরা সকলে লেভির অধ্যাপনার পঞ্চবিংশতি বৎসরে যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন তাতেই তাঁদের শ্রদ্ধার গভীরতার পরিমাপ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই—পল পেলিও, (Paul Pelliot), ফুশে (Foucher), ফিনো (Louis Finot), ইউবের (Ed. Huber), জুল ব্লক (Jules Bloch) মাস্‌পেরো (Henri Maspero) প্রমুখ সকলেই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত।

ফ্রান্সে লেভি পাণ্ডিত্যের সেই ধারা অনুসরণ করেছিলেন যে ধারার প্রবর্তক ছিলেন ইউজেন বু্র্নুফ (Eugene Burnouf) ও পরিপোষক ছিলেন আবেল বেরগেঙ

(Abel Bergaigne) ও এমিল সেনার (E. Senart)। বুর্নুফের সময় থেকে শতাধিক বৎসর গত হয়েছে—কিন্তু তাঁর কাজের মূল্য এখনো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। আঁকৃতিল দু-পেরোঁ (Anquetil du Perron) প্রাচীন ইরানের ধর্মশাস্ত্র আবেস্তা উদ্ধার করে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সামনে দিলেন তখন যে সব পণ্ডিত সেই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা ও ভাব নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁদের মধ্যে বুর্নুফ হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয়। বুর্নুফ তাঁর কঠোর সাধনার দ্বারা আবেস্তার আলোচনায় পরবর্তী পণ্ডিতদের পথপ্রদর্শক হলেন – তাই তাঁর গ্রন্থ ১৮৩৩-৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনো সমাদরণীয়। কিন্তু বুর্নুফ ছিলেন কলেজ দ' ফ্রান্সে (College de France) সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাই ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পর তিনি আবেস্তার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা সুরু করেন। তখন নেপাল থেকে হজসন (Hodgson) ইউরোপে বহু সংস্কৃত পুঁথিপত্র পাঠিয়েছেন। এইসব পুঁথির সাহায্যে বুর্নুফ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন—*Introduction a l histoire du Bouddhisme Indien* সে-গ্রন্থেও রয়েছে নূতন পথের পরিচয়। এই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে যথাসম্ভব মাঞ্চু মঙ্গোল, তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্যের তুলনা করে তিনি বৌদ্ধসাহিত্যের যে-খসড়া দিলেন তাকে আমরা এখনো উপেক্ষা করতে পারি নে।

বুর্নুফের কথা তুলবার কারণ এই যে তিনিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হয়েছিলেন, আর তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে সে-কৃষ্টির প্রাচীন ইতিহাস কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধার হ'তে পারে না। বুর্নুফের পর ফ্রান্সে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় পথপ্রদর্শক হলেন তাঁর নাম হচ্ছে আবেল বেরগেঙ (Abel Bergaigne)। আবেস্তার আলোচনায় বুর্নুফের যে স্থান বৈদিক গবেষণায় বেরগেঙেরও সেই স্থান। ইউরোপে তাঁর পূর্বে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কেউই ঠিক পথ খুঁজে পান নি। বেদের অর্থ নির্ণয়ে তাঁরা অনেক স্থলেই হয় সায়ণভাষ্যের ন্যায় পরবর্তী সাহিত্যের না-হয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—সেইজন্য প্রায়ই তাঁরা একই শব্দের নানা অর্থ নির্ধারণ করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বেরগেঙ প্রথম দেখাতে চেষ্টা করলেন যে বৈদিক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা হবে, কারণ পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারেরা বেদের সঠিক অর্থ ভুলে গেছেন। বেরগেঙের নির্ণীত অর্থ সব-সময়ে গ্রাহ্য না হ'লেও তিনি ঋগ্বেদের নানা মণ্ডলের তুলনামূলক বিচার করে—মণ্ডলগুলির যে-পারম্পর্য নির্ণয় করলেন ও তাঁর বিরাট গ্রন্থ—*La Religion vedique d' apres les hymnes du Rigveda*-এ বৈদিক দেবতাদের যে-স্বরূপ নির্ধারণ করলেন তা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তা ছাড়া বৈদিক interptetation-এ তিনি যে-প্রণালী অবলম্বন করলেন তা পরবর্তী পণ্ডিতদের অনুসরণীয় হ'ল। বেরগেঙ ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আল্‌প্‌সের হিমানী গহ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, কিন্তু বৈদিক গবেষণা ও বৃহত্তর ভারত, বিশেষ করে চম্পার প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকার্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বেরগেঙের কথা উত্থাপন করতে হ'ল তার কারণ লেভি হচ্ছেন বেরগেঙের শিষ্য আর

লেভি নিজেই চেয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যদি কেউ চার লাইন লিখতে চায় তার ভিতর অন্তত তিন লাইন যেন বেরগেঙের সম্বন্ধে লেখা হয়। বেরগেঙের শিষ্যত্ব গ্রহণে লেভিকে পরামর্শ দেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনাঁ (Ernest Renan)। লেভি যে সে-শিষ্যত্বের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বুঁনুফ ও বেরগেঙের প্রভাবে লেভির প্রতিভা বহুমুখী হয়ে উঠেছিল—বুঁনুফের প্রভাবে তাঁর দৃষ্টির ব্যাপকতা ও বেরগেঙের শিক্ষায় তীক্ষ্ণতা লাভ করেছিল।

যেসব পণ্ডিত ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেছেন লেভি তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার কারণ এ নয় যে তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানতেন, কিন্তু সে-ভাষায় তাঁর চাইতেও বড় পণ্ডিত জন্মেছেন। তিনি চীনা ও তিব্বতী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু তাই বলে তাঁকে Sinologist অথবা Tibetanist বলা চলে না। মধ্য এশিয়ার ছিন্ন পুঁথিপত্র থেকে তিনি লুপ্ত ভাষার উদ্ধারসাধন করেছিলেন—কিন্তু সে-কাজে অন্যান্য পণ্ডিতও আত্মনিয়োগ করেছেন। লেভির পাণ্ডিত্যে বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর মধ্যে এই সমস্ত বিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়েছিল—আর সেই সমস্ত বিদ্যাকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকল্পে।

লেভি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্য হ'তে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা নেই বললেই চলে, কোনো প্রাচীন গ্রন্থকারের রচনার কাল সঠিক নির্দেশ করবার মতো উপাদান সে-সাহিত্যে নেই, শিলালিপি বা প্রাচীন মুদ্রা থেকে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান তা থেকে কিছু সংগৃহীত হতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির সত্যকার ইতিহাস সে-উপাদানের সাহায্যে অঙ্কিত হ'তে পারে না। তা ছাড়া, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শুধু চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যেতে পারে। এসব কারণে লেভির দৃষ্টি প্রথম থেকেই চীনা ও তিব্বতী সাহিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

লেভির প্রথম বই *Le Theatre Indien* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ-বইয়ে তিনি প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও নাটকের ক্রমবিকাশের আলোচনা করেন। তাঁর পূর্বে জার্মান পণ্ডিত বিন্দিশ (Windisch) দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গ্রীক প্রভাবেই হচ্ছে ভারতীয় নাটকের জন্ম। লেভি এ-মতবাদ খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে, যে-মনোবৃত্তি থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম সে হচ্ছে ধর্মভাব—আর সে হিসাবে ভারতীয় নাটক তার স্বকীয়তা বরাবর রক্ষা করেছে। *Le Theatre Indien* প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে লেখা হলেও এখনো যে সে-বই তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায় নি তার সাক্ষ্য সম্প্রতি কিথ্ (Keith) তাঁর নূতন *Indian Drama* গ্রন্থে দিয়েছেন। লেভির এ-বই পড়তে সকলেরই ভালো লাগে, তার কারণ লেভির লেখা হচ্ছে সরস—যে-গুণ সাধারণত এ-জাতীয় লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। স্টাইল হিসাবে লেভি রেনাঁর শিষ্য; সুতরাং ইতিহাস বা আলোচনামূলক প্রবন্ধে রচনারীতিতে লেভি বরাবর রেনাঁর আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

Le Theatre Indien লিখবার পর নেপালের ইতিহাস *Le Nepal* ছাড়া লেভি

আর কোনো সত্যকার বই লেখেন নি। তাঁর সম্বন্ধে বেরগেঙের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হয়েছে —বেরগেঙ তাঁকে বলেছিলেন যে, 'লেভি তুমি যদি বই লিখতে চাও তাহলে পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্বে তা লিখে ফেল—পরে আর বই লিখতে পারবে না'। *Le Theatre Indien* লেখা শেষ হয় যখন লেভির বয়স চব্বিশ বৎসর।

নূতন বই না লিখতে পারবার কারণ এই যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এত নূতন সমস্যা ও ঐতিহাসিক উপাদানের এত অভাব যে সেসব সমস্যার সমাধান না করলে ও নানা দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ না করতে পারলে কোনো বই লেখার চেষ্টা বিফল হ'তে বাধ্য। আর সেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা কী কষ্টসাধ্য তা লেভির নিজের কথাতেই বলা ভালো—**From the Mediterranean to the Pacific ocean nations near and far gather round India and bring together converging rays to shine upon the voiceless night of her past. The picture that emerges is not, to be sure, as clear and complete as we could wish ; too often the documents say nothing or break off just at the moment when curiosity is on the track ; too often besides the portions upon which light is thrown give us minute details which by their seeming insignificance weary and discourage the student.**

এই কষ্টসাধ্য কাজেই লেভি তাঁর সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রথম গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারত ও ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে যেসব উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির আলোচনা করেন— এই আলোচনার ফল তিনি তাঁর লাতিন ভাষায় লিখিত বই—*Quid de Graecis veterum indorum monumenta tradiderint* (1890) ও অন্যান্য প্রবন্ধে—La Grece et l' Inde d'apres les monuments, 1891, Le Bouddhusime et les grecs 1891…লিপিবদ্ধ করেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের ইতিবৃত্ত অঙ্কন ও পাণিনীয় সূত্রে উল্লিখিত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নানা জাতির সম্বন্ধে সমসাময়িক গ্রীক সাহিত্যে যেসব সংবাদ পাওয়া যায় তার তুলনামূলক বিচার করেন। তাঁর মতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ঢেউ গ্রীস পর্যন্ত পৌঁছেছিল ও খৃষ্টধর্ম খুবসম্ভব তার কিছু প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

লেভির মতে বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি জাতীয় কৃষ্টি, তা বরাবর ভারতের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছে আর সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা অটুট রাখবার জন্য বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, সমাজ নিয়ন্ত্রণে, শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে ঐক্য আনবার চেষ্টা। বৌদ্ধধর্ম জাতীয়তার গণ্ডি অতিক্রম করে বিজাতীয়দের ভারতের অঙ্কে স্থান দিয়েছে আর ভারতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তা বিদেশে বিলিয়েছে। এশিয়াখণ্ডের নানা জাতি এক সময়ে এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সভ্যতার গণ্ডিতে উন্নীত হয়ে ভারতের অনেক অধুনালুপ্ত রত্ন সযত্নে রক্ষা করেছে। সুতরাং বিশ্বমানবিকতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাইতে বৌদ্ধধর্মের স্থান উচ্চে।

লেভি এই মনোবৃত্তি পোষণ করতেন বলে বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ইতিহাসের আলোচনায় তিনি প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সাহিত্য এখন লুপ্ত। সে-সাহিত্য লেখা হয়েছিল মগধের ভাষায় যে-ভাষায় বুদ্ধদেব নিজে ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী এই নূতন ধর্ম-প্রচার করেছিলেন। ধর্ম যখন প্রসার লাভ করলো ও পশ্চিম ভারতে—অবন্তী, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেই-সেই দেশের ভাষায় নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল, পশ্চিম ভারতে পালিভাষায় ও কাশ্মীরে সংস্কৃতে। এই দুই নূতন সাহিত্য যে প্রাচীন মাগধী সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে তার প্রমাণ হচ্ছে—প্রথম ঐ দুই নূতন সাহিত্যের ভাষা মাগধী না হ'লেও তাদের উপর মাগধীর সুস্পষ্ট ছাপ ধরা যায়, দ্বিতীয়, ঐ দুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রায়শই তারা এক মূল সাহিত্যের অনুবর্তী। সুতরাং পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য উভয়েই অর্বাচীন, মূল প্রাচীন সাহিত্য তার রূপ হারিয়ে তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য আমরা আংশিকভাবে পাই নেপাল ও মধ্যএশিয়ার পুঁথিপত্রে এবং চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে।

বৌদ্ধ-দর্শনের দুটি প্রধান সম্প্রদায় যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুই দর্শনের মূলগ্রন্থের উদ্ধারের জন্যও আমরা লেভির নিকট ঋণী। যোগাচারের মূল গ্রন্থ অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার ও বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠাতা বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির পুঁথি লেভি নেপাল থেকে উদ্ধার করেন ও তাদের তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর সঙ্গে তুলনা করে ঐ দুই দার্শনিক মতবাদের আলোচনার প্রধান ভিত্তি স্থাপন করেন।

মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও লেভি Pelliot ও Stein-এর আবিষ্কৃত পুঁথিপত্র ও চীনা বৌদ্ধসাহিত্যের থেকে বহু উপাদান সংকলন করেন। ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে Paul Pelliot প্রায় তিন বৎসর (১৯০৮-১৯১) মধ্যএশিয়ার নানা স্থানে অনুসন্ধান চালান। তিনি যেসব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন লিপিতে লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধারের ভার পড়ে লেভির উপর। এইসব পুঁথির মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যের খণ্ডিত পুঁথির পাঠোদ্ধার করবার সময় লেভির দৃষ্টি এক নূতন ও লুপ্ত ভাষায় লিখিত পুঁথির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার যত সহজে সম্ভব হয় তার অর্থবোধ ততটা সহজসাধ্য ছিল না। এই পুঁথির মধ্যে কতকগুলি ছিল দ্বৈভাষিক অর্থাৎ সংস্কৃত সূত্র ও তার এই অজ্ঞাত ভাষায় অনুবাদ। তা ছাড়া অন্যান্য পুঁথিগুলির চীনা অনুবাদও লেভি খুঁজে বের করলেন। এইসব উপাদানের সাহায্যে লেভি এই লুপ্ত ও অজ্ঞাত ভাষার পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করলেন। এ-ভাষা ছিল মধ্যএশিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত কুচা প্রদেশের ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও এশিয়া খণ্ডের একমাত্র কেণ্টুম ভাষা—অর্থাৎ সে-ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সেই শাখা থেকে উদ্ভূত যা থেকে গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু সে-ভাষার উদ্ধারসাধন করেই লেভি নিশ্চেষ্ট রইলেন না—চীনা ও মধ্যএশিয়ার সাহিত্য থেকে তিনি প্রাচীন কুচা ও কুচীয় জাতির ইতিহাস উদ্ধার করলেন। এই জাতি বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় কৃষ্টি বহু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল, ও তার প্রসারে সহায়তা

করেছিল। সুতরাং প্রাচীন কুচার অনুনালুপ্ত ভাষা, কুচার প্রাচীন ইতিহাস ও সে-দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধেও আমরা লেভির নিকট ঋণী।

সারাজীবন ধরে লেভি যে কাজ করেছেন তার ফলাফল অধস্তনেরা ভোগ করবে। তিনি শতাধিক প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাসের সবচাইতে অজ্ঞাত কোণগুলির উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতের কৃষ্টির বিদেশে প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক সাহিত্য থেকে বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ করেছেন ও নূতন আলোচনার জন্য পথনির্দেশ করেছেন। সেসব পথ অনুসরণ করে আরও নূতন তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের পূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব হবে হয়তো বর্তমান যুগে— তা লেভির যুগে সম্ভব না হলেও লেভির নাম সেখানে অমর হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে লেভির পরিকল্পনা ছিল বিরাট। ভারতের ইতিহাস তার বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সে-ইতিহাসে স্থান থাকা চাই ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের। সেসব দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল বলেই যে ভারতের ইতিহাসে তাদের স্থান থাকবে তা নয়, ভারতীয় সভ্যতা তার বিচিত্র রূপে বৈদেশিক জাতিকে সভ্যতার কোঠায় তুলেছে— সুতরাং রূপের সে-বিচিত্রতাকে অঙ্কিত না করলে ভারতের ইতিহাস হবে কঙ্কালসার। এ-পর্যন্ত ভারতের যেসব তথাকথিত ইতিহাস লেখা হয়েছে সে-ইতিহাস হচ্ছে রাজনৈতিক— কিন্তু সত্যকার ইতিহাস অঙ্কিত করতে হলে দেশের সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতির ক্রমবিকাশ উপেক্ষা করা চলে না।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আশা ভরসা সম্বন্ধে লেভির মতামত জানতে আমরা স্বতই কৌতূহলী— তার কারণ তিনি এক হিসাবে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যদি জাতিতে ইংরাজ হতেন তাহলে এ-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে হয়তো কোনো কুণ্ঠা হ'ত না। কিন্তু তিনি ফরাসী বলেই হয়তো এ-সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। তাঁর অন্যান্য লেখায় যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে বুঝতে পারি যে, তাঁর মতে আমাদের বর্তমান যুগের যে-জাতীয়তা এসেছে তার মূলে রয়েছে ইউরোপীয় প্রভাব। প্রাচীন ভারতে কোনো জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রাচীন সাম্রাজ্য হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী— ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হচ্ছে স্থায়ী। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে সমস্ত ভারতীয় কৃষ্টিতে একটা ঐক্য এসেছিল— কিন্তু সে-ঐক্য থেকে জাতীয়তা আসে নি। আর সেই জাতীয়তার অভাবেই ভারতের রাজনৈতিক দুর্গতি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের রূপ বদলেছে একথা সত্য— কিন্তু লেভি স্বীকার করেছেন যে সেই প্রভাবে তার দৈন্যও বেড়েছে। পাশ্চাত্যের ঢেউ যেখানেই লেগেছে সেখানেই প্রাচ্যজাতি দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছে, নিজের জাতীয় কৃষ্টির সঙ্গে যোগ হারিয়েছে। প্রাচ্য জাতিসমূহ তাদের এই দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে বর্তমানে সাবধান হয়েছে ও সেইজন্য প্রতীচ্যের সঙ্গে তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। প্রাচ্যের আশা ভরসা বুঝে যদি প্রতীচ্য তাকে পথের অনুসন্ধানে সাহায্য না করে তাহলে সেই বিরোধই হবে ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বনেশে।

আবেল বেরগেঙ ও বেদানুশীলন

ফরাসী অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভির নানা কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আবেল বেরগেঙের (Abel Bergaigne) নাম উল্লেখ করেছি। সেই সম্পর্কে এ-কথাও আমি বলেছি যে বুর্নুফের পর ফ্রান্সে বেরগেঙ সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় কৃষ্টির আলোচনায় পথ-প্রদর্শক হন। ইউরোপে তাঁর পূর্বে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কেউই ঠিক পথ খুঁজে পান নি। বেদানুশীলনে তাঁরা অনেকেই হয় সায়ণভাষ্যের ন্যায় অর্বাচীন গ্রন্থের না হয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন— সেইজন্য তাঁরা প্রায়ই একই শব্দের নানা অর্থ নির্ধারণ করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বেরগেঙ প্রথম দেখাতে চেষ্টা করেন যে বৈদিক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা হবে, কারণ পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারেরা বেদের সঠিক অর্থ ভুলে গেছেন। বেদানুশীলনে বেরগেঙের স্থান ঠিক কোথায় তা আমি এ-প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করব।

বেরগেঙ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আল্পসে পর্বতারোহণ করবার সময়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের চেষ্টায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য L' Ecole des Hauts Etudes স্থাপিত হয় এবং বেরগেঙ এই শিক্ষায়তনে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনা গ্রহণ করেন।

বেরগেঙ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বলে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার সৌকর্যের জন্য তাকে নানা কাজ করতে হয়েছিল। সেই কারণে তিনি 'ভামিনীবিলাস' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থ সম্পাদন করেন ও পরে বৈদিক ভাষা শিক্ষার জন্য একখানি গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র আঁরি (Henry) *Manuel pour etudier le Sanscrit Vedique* নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন উপনিবেশ চম্পায় যেসব সংস্কৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় বেরগেঙের উপর সেগুলির সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়; এ-কাজও বেরগেঙ অতিদক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু সে-গ্রন্থও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম শিষ্য সিলভঁ্যা লেভির যত্নে প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের নাম *Inscriptions Sanscrites de Compa et du Cambodge.*

কিন্তু বেরগেঙের স্মরণীয় কীর্তি হচ্ছে বেদানুশীলন। ভারতবর্ষ হতে বেদানুশীলন বহুদিন লোপ পেয়েছিল। বিগত শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে এ-অনুশীলন পুনর্জীবিত হয়েছে। এ-অনুশীলনে পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন জার্মান পণ্ডিত Roth এবং তাঁর পরে জার্মানীতে Ludwig, Grassmann প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে। এ-অনুশীলন পরিপুষ্টিলাভ করতে থাকে। এই সময়ে বেরগেঙের আবির্ভাব।

বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে বেরগেঙের বিস্তৃত আলোচনা যে-বইয়ে প্রকাশিত হয় সে-বই হচ্ছে *La Religion Vedique d'apres les hymnes de Rgveda* ; এই বই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বৈদিক ধর্মের আলোচনায় বেরগেঙ যে-পথ অবলম্বন করেন তা অভিনব। তাঁর মতে এ-ধর্ম বুঝতে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য বা ইরানীয় ধর্মপুস্তক আবেস্তার কোনো সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কারণ পরবর্তী বৈদিক টীকা-টিপ্পনী ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অসম্পূর্ণ বৈদিক শব্দের ধাতুগত অর্থ নির্ণয়ে আবেস্তার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু সেসব শব্দের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বুঝতে আবেস্তা হতে কোনো সাহায্যই পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈদিক ধর্মের চিত্রাঙ্কন হতে পারে শুধু বেদের সাহায্যে, এবং চতুর্বেদের মধ্যে যখন ঋগ্বেদসংহিতাই হচ্ছে প্রধান তখন সেই ঋগ্বেদের সঠিক অর্থ নির্ণয় করাই হচ্ছে প্রথম কর্তব্য।

ঋগ্বেদের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে সেই বেদের নানা সূক্তের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন সে-কথা বেরগেঙ বহুবার বলেছেন এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে ঋগ্বেদ হতে অন্তত ১৬০০০ পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এইসব পদ উদ্ধার করে তিনি বৈদিক শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়েব চেষ্টা করেছেন। এই তুলনামূলক বিচার হতে একথা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে বৈদিক ঋষিগণ বহুপরিমাণে উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন। বেরগেঙের এ-কথা উদাহরণে স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে—

পৃথু রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যেনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।

এ-পদের সাধারণ অর্থ হচ্ছে— 'দক্ষিণা'র বৃহৎ রথ প্রস্তুত হয়েছে ; এ-রথের উপরে অমর দেবগণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন'।

এ-সূক্তে 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ নির্ণয় না করতে পারলে সত্যকার কোনো অর্থবোধ হয় না। বেরগেঙের পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা এ-স্থলে দক্ষিণার অর্থ করেছিলেন উষা। কিন্তু ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলে যেখানে এই দক্ষিণা শব্দের প্রয়োগ আছে—সেখানে দক্ষিণা শব্দের এ-অর্থ গ্রহণ করলে অর্থসংগতি থাকে না ; যথা— জয়েম তং দক্ষিণয়া রথেন (১।১২৩।৫) —'দক্ষিণাকে রথ করে আমরা তাকে জয় করব' ; 'ইয়ম্ দক্ষিণা পিন্বতে সদা' (১।১২৫।৫) ; তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরম্ (১০।১০৭।৪) ; অ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা (৯।৭১।১)। সুতরাং পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ কোথাও 'উষা', কোথাও 'যজ্ঞের দক্ষিণা', কোথাও 'দুগ্ধবতী গাভী' এবং কোথাও বা 'দুগ্ধ' করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু বেরগেঙ বলেন যে 'দক্ষিণা' শব্দ সর্বত্রই এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বৈদিক ভাষায় দক্ষিণা হচ্ছে মূলত দেবতাগণের প্রদত্ত দক্ষিণা এবং তাঁদের যজ্ঞের অনুকরণে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ যে-যজ্ঞ সম্পাদন করেন সে-যজ্ঞেও পুরোহিতকে যা দান করা হয় তা সেই দক্ষিণার অনুরূপ দক্ষিণা। ঋগ্বেদের যেসব স্থানে দেবতাদের প্রদত্ত দক্ষিণার উল্লেখ রয়েছে বেরগেঙ সেসব পদের তুলনামূলক বিচার করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে দক্ষিণা শব্দের এ-অর্থ যদি ঠিক হয় তাহলে সে-শব্দ উষার বিশেষণ হয়েছে কোন্ হিসাবে এবং দক্ষিণাকে রথ, গাভী ইত্যাদিই বা বলা হয়েছে কোন্ অর্থে ? এখানে বেরগেঙ বলেন যে বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে উষা হচ্ছে দেবতাদের দক্ষিণার

প্রতীক ; তাকে রথ বলা হয়েছে তার কারণ তাকে অবলম্বন করেই যজ্ঞের অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনো যায়, এবং 'দক্ষিণা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে তাকে গাভী বলা হয়েছে। বেদানুশীলনে বেরগেঙের দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। তাঁর এ-দৃষ্টি বিকৃত কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে এ-প্রণালীতে বৈদিক শব্দের অর্থ নির্ধারণে তিনি যে কল্পনার বশবর্তী হন নি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ; শোনা যায় সমস্ত ঋগ্বেদ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং হয়তো সেই কারণে শব্দের নানা প্রয়োগ তুলনা করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজসাধ্য। এই তুলনামূলক বিচারের দ্বারা তিনি শব্দের সেই অর্থ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন যা সুসংগত-ভাবে সর্বত্র প্রযোজ্য।

এই পদ্ধতিতে বেদব্যাখ্যা করে বেরগেঙ বৈদিক ধর্মের যে রূপ নির্ণয় করলেন তা সম্পূর্ণ নূতন। যজ্ঞ হচ্ছে বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং সেকথা বেরগেঙও স্বীকার করেন। কিন্তু সেই কারণে যে বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ইরানীয়দের বা পরবর্তী হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পৃথক ছিল সে-সম্বন্ধে বেরগেঙ ভিন্ন অন্য কোনো পণ্ডিত তাঁর মতো সাবধান নন। বেরগেঙের মতে যজ্ঞ যে শুধু বৈদিকধর্মের প্রধান অঙ্গ তা নয়, সমস্ত বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক দৃষ্টি সেই যজ্ঞের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সে-যজ্ঞ ও ধর্ম বৈদিক ঋষিদের নিজস্ব বস্তু। সে-হিসাবে তাঁরা ছিলেন একদল বিশেষজ্ঞ বা specialists যাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অসাধারণ। বেদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সেই বৈদিক ঋষির সম্পত্তি যার ভিতর সাধারণ ইতিহাসের তথ্য খোঁজা নিরর্থক।

এই বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে যজ্ঞ হচ্ছে স্বর্গীয় ব্যাপারের পুনরনুশীলন মাত্র। স্বর্গীয় ব্যাপার দুই প্রকাব— সূর্য-কেন্দ্রীয় ও অন্তরীক্ষ-কেন্দ্রীয়। সূর্যকেন্দ্রীয় জগতে সূর্য হচ্ছেন দেব ও উষা হচ্ছেন দেবী ; অন্তরীক্ষে সূর্যের প্রতীক দেব হচ্ছেন অগ্নি ও দেবী হচ্ছেন নভস্ বা মেঘসমূহ। সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অন্তবীক্ষেব সমস্ত দেবতারাই পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর সকল দেবতাই হচ্ছেন অগ্নিব বিভিন্ন রূপ ; স্বর্গে সে-অগ্নি হচ্ছেন সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ।

উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে এই দেব-দেবীদের কখনো মানুষ কখনো বা পশুজাতির কোঠায় ফেলা হয়েছে। সেইজন্য দেবগণকে নানা স্থানে বলা হয়েছে পুরুষ, অথবা পুংজাতীয় পক্ষী, অশ্ব, বৎসতরী, বলিবর্দ এবং দেবীগণ ঘোটকী গাভী প্রভৃতি আখ্যা পেয়েছেন। এই দুই জাতির মধ্যে মনুষ্যজগৎ বা পশুজগতে যে-যে সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হয় দেবতাদের ব্যাপারেও সেই-সেই সম্বন্ধ আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন দেবদেবীদের যৌন সম্বন্ধের কথা বলা হয় তখন বুঝতে হবে সূর্যকেন্দ্রীয় জগতে বা অন্তরীক্ষে হয়তো দুটি ব্যাপার একসঙ্গে ঘটছে। সেই দুটি ব্যাপারের পৌর্বাপর্য অনুসারে দেবদেবীর সম্বন্ধ পিতামাতা ও পুত্রের এবং পুত্র ও পিতামাতার সম্বন্ধ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এই কারণে সূর্যকে কখনো উষার অপত্য এবং কখনো উষার পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কারণেই কখনো-কখনো ঋগ্বেদে ভ্রাতাভগ্নী এবং পিতা ও কন্যার যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ পাই এবং এমন কথাও শুনতে পাই যে 'কন্যা পিতাকে প্রসব করেছে' বা 'পুত্র মাতাকে জন্ম দিয়েছে'। স্বর্গীয় বা অন্তরীক্ষের ঘটনাবলীর পৌর্বাপর্যই এসব উক্তিতে উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে সূচিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষের ব্যাপারের সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাবলীর যোগাযোগ

সম্বন্ধে বেরগেঙ কি বলেছেন। তাঁর হিসাবে পৃথিবীর দেবতাগণও পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন অগ্নিস্বরূপ ; স্বর্গীয় অগ্নি সূর্যের প্রতীক এবং দেবীগণ হচ্ছেন উষার প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞের দুটি প্রধান অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে সোম বা যজ্ঞের অন্যান্য আহুতি সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ, এবং অন্যটি হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সে-আহুতি প্রদান। দ্বিতীয় অঙ্গে অগ্নি হচ্ছে দেব এবং আহুতি হচ্ছে দেবী সে-আহুতি সোম, হবিঃ দুগ্ধ যা-ই হোক। সেই কারণে অগ্নি ও আহুতি পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে কল্পিত হয়েছে, এবং তাদের ব্যাপারে স্বর্গীয় ঘটনাবলির নানা সম্বন্ধও উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে আরোপিত হয়েছে। যজ্ঞের প্রথম অঙ্গ বা আহুতি প্রস্তুতকরণের ব্যাপারেও বৈদিক ঋষির চোখে সমজাতীয় ঘটনাই ঘটছে। এ-অঙ্গে সোম হচ্ছে পুরুষ, দেব এবং তার সঙ্গে যা মিশ্রিত হচ্ছে, জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তা হচ্ছে স্ত্রী, দেবী। সুতরাং তাদের মিশ্রীকরণের ব্যাপারও নানা সম্বন্ধের দ্বারা সূচিত হয়েছে, যে-সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়েছে স্বর্গে সূর্য ও উষার বা অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও মেঘের মিলন বা পৌর্বাপর্যের ব্যাপারে। এই কারণে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গে যদি সোম পুরুষ ও দ্বিতীয় অঙ্গে স্ত্রী হিসাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই।

পূর্বে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে বেরগেঙের মতে বৈদিক ঋষি পৃথিবীতে যে যজ্ঞের সংঘটন করছেন তা সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অন্তরীক্ষের ব্যাপারের অনুকরণ বা পুনরানুশীলন (reproduction) মাত্র। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্তরীক্ষের এবং সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের একই অগ্নি। সুতরাং পৃথিবীর অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারলে এবং সে-অগ্নির সঙ্গে আহুতির মিলন সংঘটন করাতে পারলে স্বর্গ ও অন্তরীক্ষের যজ্ঞই সম্পাদিত হবে ও তাঁদের নিজেদের অভীষ্ট সাধিত হবে এবং স্বর্গীয় ব্যাপারের গতি তাঁদের ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে। এ-সম্পর্কে বেরগেঙের নিজের কথার অনুবাদ দেওয়া সংগত—

"The Vedic seers thought that the celestial atmospheric, and the terrestrial fires (the last kindled by the sacrificer) were identical. The celestial and terrestrial waters were also the same. The Vedic seers, by reproducing the natural process by corresponding modes of representations, believed they were able to assure the stability of these processes and by a sort of *envountement* (sympathetic magic) influence the march of celestical phenomena."

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে অন্যান্য লোকে যে-যজ্ঞ সংঘটিত হচ্ছে সে-যজ্ঞের পুরোহিত কে ? বেরগেঙ বলেন যে সে-পুরোহিত হচ্ছেন পিতৃগণ ; বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে এঁরা হচ্ছেন তাঁদের নিজেদের পিতৃগণ। অন্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে ত্রিলোকের দেবদেবিগণ যদি মূলত অগ্নিযোম হন তাহলে ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বরূপ কি ? এসব দেবতাদের বর্ণনা থেকে তাঁদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে ধরা যায় না। একথা বেরগেঙ স্বীকার করেছেন যে ইন্দ্রের সঙ্গে হয়তো যজ্ঞের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ইন্দ্র সম্বন্ধীয় সমস্ত বৈদিক উক্তির তুলনা করে তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রও অগ্নিস্বরূপ। অবশ্য অনেকস্থলে এ রূপ পরিবর্তিত হয়েছে এবং **"he is an intermediary between the sacrificer**

and the divinity. This is probably a new and late aspect of the cult according to which the sacrifice did not act directly but through the intermediary of a divinity."

রুদ্র হচ্ছেন বৈদিক দেবতাদের মধ্যে একজন প্রধান দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলেও তিনি হচ্ছেন মূলত মরুৎগণের পিতা এবং এই মরুৎগণ হচ্ছেন অন্য হিসাবে সূর্যকেন্দ্রীয় জগতে হোতা ও দ্যোসের সন্ততি। সুতরাং একদিকে রুদ্র হচ্ছেন হোতাস্বরূপ অন্যদিকে অগ্নিস্বরূপ। মরুৎগণ অন্যত্র বায়ুর সন্ততি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং রুদ্র বায়ুও বটে। রুদ্র ও পর্জন্য অন্যত্র অভিন্নভাবে পরিকল্পিত হয়েছেন। সেই কারণে বেরগেঙের মতে রুদ্র = বায়ু, পর্জন্য স্বর্গীয় হোতা, দ্যোস্ এবং মূলত অগ্নি।

বেরগেঙের মতে বৈদিক ঋষিগণ প্রাথমিক সভ্যতার যুগের কবি নন, এবং বৈদিক মন্ত্রও নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা নয়। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে তাঁদের যজ্ঞ ও সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের ঘটনাবলীর যোগসূত্র অতিদৃঢ় এবং এই দুইয়ের সম্বন্ধ বৈদিক ঋষি একটি বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এ-রচনা পদ্ধতি আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না বটে তবে বৈদিক ঋষির নিকট তা ছিল অতি সহজ এবং স্বর্গীয় ও পৃথিবীর নানা পৃথিবীর নানা ঘটনাবলির সম্বন্ধ উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে উল্লেখ করাই ছিল তাঁদের পক্ষে অতিস্বাভাবিক।

বেরগেঙের মতামত অনেকে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি, তার কারণ এমন কোনো পণ্ডিত জন্মান নি যিনি সমস্ত ঋগ্বেদের একটা সুসংগত অর্থ নির্ণয় করবার দুরাশা পোষণ করতে পারেন। সেই-জাতীয় কোনো পণ্ডিত অবতীর্ণ হলে হয়তো বেরগেঙেব গবেষণা-পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়বে।

কিন্তু বেরগেঙ বৈদিক ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে যে-কাজ করেছেন তা ইউরোপে বেদানুশীলনকে যে যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে দিয়েছেন একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বৈদিক শব্দের একটি অভিধান তৈরি করাও ছিল বেরগেঙের উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি আরম্ভ করেছিলেন মাত্র, শেষ করতে পারেন নি। তাঁর নানা কল্পনা কার্যে পরিণত না করতে পারলেও বেরগেঙ যে-কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

ফরাসী জীবন

ইংরাজের আদবকায়দা আমরা যে বহু পরিমাণে অঙ্গীকার করে নিয়েছি এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাদের সুসংস্কারগুলি যতটা পেয়ে থাকি আর না থাকি তাদের কুসংস্কারের ভূত আমাদের ঘাড়ে পুরোমাত্রায় চেপে বসেছে— তাই অনেক স্থলেই আমরা আজও অন্য জাতির চরিত্র বিচার করতে গিয়ে ইংরাজের চোখেই করে থাকি। ফলে নিজেদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। সেইজন্যই আমাদের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদেরও বলতে বাধে না— 'London is London'। অর্থাৎ লণ্ডনের মতো স্থান দুনিয়ায় নেই— আর সেখানে যে-শিক্ষালাভ করা যায় সে-শিক্ষা নাকি কোথাও মেলে না।

ফরাসী জাতি-সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে— তাদের দেশ নাকি স্ফূর্তি করবার স্থান— শিক্ষার স্থান নয়— তাই আমাদের দেশের ছেলেরা সেখানে গেলেই নাকি বয়ে যায়। এ-ধারণাও আমরা ইংরাজের কাছ থেকে পেয়েছি। ইংরাজ যখন ফরাসীদেশে পৌঁছয় তখন সে তার অভ্যস্ত রীতিগুলি না দেখতে পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ ফরাসীদেশে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তার বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে যায়,— বাড়ির জানালাগুলি ভিতরে না খুলে বাইরে খোলে আর সব জানলাতেই শার্সি থাকে। প্যারিসের মতো বড় শহরেও বাড়িগুলি বেশির ভাগ চক্‌-মিলানো— আর তার মাঝখানে উঠোন। বাড়ির নিচুতলায় দোকান, উপরে নানা পরিবারের বাস। আর সমস্ত বাড়িটার উপর নজর রাখবার জন্য দরজার নিকট ঘর নিয়ে থাকে Concierge। ফরাসীরা কেউ সকালে breakfast খায় না— দুপুরে lunch খেতে সবাই ঘরে ফিরে আসে। যখন তারা গল্প করতে চায় তখন 'কাফে'-তে একটা drink নিয়ে দু'ঘণ্টা বসে কাটিয়ে দেয়। নিজের দেশের বিপরীত এইসব রীতি ইংরাজের ভালো লাগে না— আর প্যারিসের হোটেলে সকালে যখন সে পুরাপেট breakfast পায় না তখন তার মন আরও চটে যায়। অথচ ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের সর্বত্রই এইসব রীতির চলতি।

ফরাসীদের সম্বন্ধে ইংরাজের কুসংস্কার দূর করবার জন্য সম্প্রতি এক ইংরাজই কলম ধরেছেন। এঁর নাম ফিলিপ কার।* বিশ বৎসরের উপর ফরাসীদেশের শহরে ও গ্রামে বাস করে তিনি ফরাসী-চরিত্রের একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। দুশো পৃষ্ঠা-ব্যাপী বইয়ে তিনি ফরাসী জাতির চরিত্র নানা দিক থেকে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ফরাসী-চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজের যে-সব কুসংস্কার, তার মূলে রয়েছে তার নিজের অহমিকা ও অন্য জাতির চরিত্রবোধে অক্ষমতা। অবশ্য ফরাসী জাতির চরিত্র যে নির্দোষ

* Philip Carr—*The French at Home*; Methuen & Co., London, 1930.

তাও তিনি বলেন না— তবে সেসব দোষ সার্বজনীন।

ফরাসীর সম্বন্ধে ইংরাজ মনে করে যে, সে স্ফূর্তিপ্রিয়, চরিত্রহীন, কুঁড়ে, জোচ্চোর ও নোংরা। এ-সব দোষ যে-কোনো জাতির চরিত্রেই মারাত্মক এবং ইংরাজের এই অভিযোগ মেনে নিলে ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হতে হয়— আর তার বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এ-জাতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে দেখা যায় যে ইংরাজের ও-সব অভিযোগের একটিও সত্য নয়। ফরাসী জাতি স্ফূর্তিপ্রিয় বটে— কিন্তু তার স্ফূর্তির ভিতর যে স্বচ্ছন্দতা ও সহজভাব আছে তা অন্যত্র দুর্লভ। এই স্বচ্ছন্দভাবই তার চরিত্রের বিশেষ গুণ। কিন্তু স্ফূর্তিপ্রিয় বলেই সে চপল-স্বভাব একথা বলা চলে না। সে যে ধীরভাবে কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম তার বহু প্রমাণ ফরাসী শিল্প, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই রয়েছে। এ-সব বিষয়ে তার মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সারা জগতই মেনে নিয়েছে। ফরাসী জাতির নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধেও ইংরাজের যা ধারণা তার মূলেও রয়েছে অহমিকা। ইংরাজ তার নিজের দেশের আবর্জনাকে যেমন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায় ফরাসী তা পারে না। বড় শহরের যে-সব আবর্জনাকে কেউ কখনো দূর করতে পারে নি, সেগুলিকে বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লোককে সাবধান করে দেওয়াই সে পছন্দ করে। তাই প্যারিসের যে-সব নাট্যশালা সুরুচিসম্মত নয় সেখানে সত্যকার ফরাসীদের বড়-একটা দেখা যায় না— সেগুলি রুচিবাগীশ ইংরাজ ও আমেরিকানদের কলধ্বনিতেই মুখরিত। তাই বলে ফরাসীরা সকলেই যে শুকদেব, তা নয়— কারণ কোনো জাতির সম্বন্ধেই সে-কথা বলা চলে না। ফরাসী জাতির নৈতিক অবনতির আর-একটা কারণ নাকি তার মদ খাওয়া। জলের বদলে ফরাসীরা মদ খায় বটে— কারণ তাদের দেশে বহু পরিমাণে আঙুর জন্মায়— আর তারা সবচেয়ে ভালো মদও তৈরি করে। কিন্তু তাই বলে তাদের ভিতর মাতলামি যে খুব বেশি এ-কথা সত্য নয় — ইংরাজ তা নিজেই স্বীকার করে, ফরাসীদেশের চেয়ে ইংল্যাণ্ডেই মাতালের সংখ্যা অধিক। ফরাসীরা যে লোককে ঠকায় তার প্রমাণ শুধু তাদের ব্যবসায়েই কিছু-কিছু পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের পর থেকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়ও তার বহু প্রমাণ মিলছে। কিন্তু ফরাসীদেশে ছোটোখাটো দোকানদার ও গ্রামের চাষীদের ভিতর লোক-ঠকানো বিরল।

ফরাসীকে কুঁড়েমি করতে প্রায়ই দেখা যায়। তাই 'কাফে'-তে দু'এক ঘণ্টা সে আনন্দের সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন কুঁড়েমি করতে চায় তখনই সে তা করে, অন্য সময়ে করে না। তাই যখন সে কোনো কাজ পাঁচ মিনিটে করবে বলে প্রতিশ্রুত হয় তখন সে কাজে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগায় না— আর কুঁড়েমি করবার ইচ্ছা থাকলে **'bonnes cinq minutes'**— লাগবে বলে দেয়,— তখন তার কাজ পনেরো মিনিটের পূর্বে শেষ হয় না। এর ভিতরে তার চরিত্রের স্বচ্ছন্দভাবই ফুটে ওঠে— মানুষকে সে যন্ত্র করতে চায় না। ফরাসী সৈন্য যখন অভিযান করে তখন তারা 'লেফ্‌ট-রাইট' করে তালে তালে পা ফেলে চলে না— মানুষের মতো স্বচ্ছন্দগতিতেই চলে। তাই বহুদূরের অভিযানে অন্য জাতির চেয়ে বেশি সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু বলেই তাদের খ্যাতি আছে।

ফরাসীকে ইংরাজ আর দুটি কারণে দেখতে পারে না— প্রথমত সে বেশি কথা বলে, আর দ্বিতীয়ত সামাজিক ব্যবহারে সে কখনো অপ্রস্তুত হয় না। ফরাসী বেশি কথা বলে

সত্য— কিন্তু তাই বলে সে কাজে অবহেলা করে না। সে বেশি কথা বললেও তার কথা কখনো এলোমেলো নয়। তার সব কথার ভিতর যুক্তির আভাস পেয়েই ইংরাজ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ফরাসীর এই বেশি কথা বলবার প্রবৃত্তিতে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর ফরাসী ভাষায় এমন একটা বাঁধুনি আছে যে সে-ভাষায় কথা কইতে গেলে ভাসা-ভাসা কথা বলা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই ঐ-ভাষা এককালে সারা ইউরোপে lingua franca হয়ে উঠেছিল— আর আন্তর্জাতিক যত কিছু সন্ধিশর্ত করা হ'ত বা এখনও হয় তা ফরাসী ভাষায়ই লেখা হয়— কারণ সে-ভাষায় কোনো বাক্য দ্ব্যর্থবোধক নয়। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসীকে কখনও অপ্রস্তুত হতে দেখা যায় না— সকলের সঙ্গেই সে সহজভাবে ব্যবহার করতে জানে। কিন্তু তার ব্যবহারের এই স্বচ্ছন্দভাবকে অস্বাভাবিক মনে করে তার স্বভাবে একটা কৃত্রিমতার দোষ আরোপ করা ইংরাজের অভ্যাস। কিন্তু ফরাসীচরিত্র ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক ব্যবহারে তার এই স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে রয়েছে অহমিকার সম্পূর্ণ অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদও যে এর মূলে নেই তা মনে হয় না। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসী চরিত্রের এই সমভাব খুব প্রাচীন— মলিয়েরের নাটকেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ফরাসী-বিপ্লবের তিনটি মূল-সূত্র হচ্ছে— **Liberté, Egalité ও Fraternité**, মৈত্রী, সাম্য ও স্বাধীনতা। সত্য কথা বলতে ফরাসীরা মৈত্রী ও স্বাধীনতার তোয়াক্কা না রাখলেও, সাম্যের উপর তাদের পুরাদস্তুর ঝোঁক আছে। সেইজন্যই ফরাসীদেশে **Lord, Sir** প্রভৃতির বালাই নেই— **Baron, Duke** দু'একজন থাকলেও তাঁরা কোণ-ঠাসা হয়ে থাকেন— নিজেদের গণ্ডির বাইরে মুখ দেখান না? **Monsieur**-র বেশি খেতাব কারো নেই— আর দেশের ও দশের কাজের জন্য কেউ যদি সরকার থেকে বিশেষ সম্মান (**Legion d'honneur**) পান তবে সে-সম্মান সাধারণত কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকে। এবং সরকারের দেওয়া রঙিন ফিতেও ঘরে তোলা থাকে, কারণ তা পরে বেরুলে লোকে নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা করে না। ফরাসীদেশে এই সাম্যভাব আছে বলেই 'রেস্তোরাঁ'তে (**Restaurant**) বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কলের মজুর এক টেবলে বসে খায়— আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে নামজাদা অধ্যাপকও লাইব্রেরিতে ঢুকে টুপি তুলে বেয়ারাকে অভিবাদন জানান ও তার করমর্দন করেন।

ফরাসীর পারিবারিক জীবনই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য। ফরাসী স্বভাবত স্বার্থপর হলেও নিজের পরিবারের জন্য যে কতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারে তা ইংরাজ কল্পনাতেও আনতে পারে না। এইজন্যই সে মিতব্যয়ী— বাইরে না খেয়ে ঘরে এসে যা জোটে তাই খায়।

এই পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে স্ত্রীজাতি। ফরাসী আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির কোনো পৃথক সত্তা না থাকলেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে তার স্থান খুব উঁচুতে। ইংরাজ যখন তার '**family**'র কথা বলে তখন সে তার নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবে। বিয়ে না করা অবধি কোনো পারিবারিক কর্তব্যের কথা তার মনে হয় না। কিন্তু ফরাসী যখন '**famille**'-এর কথা বলে তখন নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে

ব্যতীত তার ভাই বোন ও পিতামাতার কথাও ভাবে। সুতরাং বিয়ের পূর্বেও তার পারিবারিক টান থাকে আর সেই পরিবারের কেউ শারীরিক অক্ষমতার জন্য সংসার চালাতে না পারলে তার সম্বন্ধে কর্তব্যজ্ঞানের কিছু অভাব হয় না। ফরাসীদেশে আইনের ও সমাজের চোখে এখনো **Conseil de famille** (অর্থাৎ পারিবারিক মন্ত্রণা-পরিষদ) উঁচু স্থান অধিকার করে। নাবালক, উন্মাদ ও অসমর্থের ব্যবস্থা করতে হ'লে এই মন্ত্রণা-পরিষদকেই আহ্বান করা হয়। আদালতের জজ (**Juge de paix**) মাতামহ-বংশের তিনজন ও পিতামহ-বংশের তিনজনকে ডেকে পরিষদ সংগঠন করেন এবং এই পরিষদই সব ব্যবস্থা করে দেয়। সামাজিক জীবনে এই পরিবারকেই **unit** ধরা হয়। তাই কোনো পরিবারে যখন কেউ মারা যায় তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সে-খবর দেবার জন্য যে-চিঠি বিলি করা হয় তাতে যে শুধু মৃতের স্ত্রীরই সই থাকে তা নয় — তার ছেলে, মেয়ে, ভাই ও তার পিতামহ ও মাতামহ-বংশের নামও থাকে। পরিবারেব এই প্রভাবের জন্য সকল ছেলে-মেয়েই পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকারী এবং কেউ তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি পেতে পারে না। ছেলে-মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে এখনো পিতামাতার হাত আছে। গ্রামে এখনো বিবাহিত মেয়ের মুখে শুনতে পাওয়া যায়— যে তার মা-ই তার জন্য ভালো 'বর' বেছে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবিবাহিত মেয়েরা এখনো গ্রামে বা শহরে কোথাও স্বেচ্ছাচার করতে পায় না। বাইরে যেতে হ'লে তারা একা যায় না— আত্মীয় বা অভিভাবকের সঙ্গেই যেতে হয়। বিবাহের পরও তারা বড় একটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় না— দক্ষতার ও সুব্যবস্থার সঙ্গে গৃহকর্ম চালানোই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সেইজন্যই নাগরিক জীবনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তাই বলে যে মেয়েরা ফরাসীদেশে কোনো স্বাধীন ব্যবসা করে না তা নয় – তাদের ভিতরও ডাক্তার, কাগজের সম্পাদক, জর্নালিস্ট ও অ্যাডভোকেট (**Avocat**) দেখা যায়। বস্তুত ফরাসীদেশেই সর্বপ্রথম মেয়েদের ভিতর অ্যাডভোকেট হয়েছিল। এ ছাড়া শহরের নানা দোকান ও আফিসে বহু মেয়ে কাজ করে।

ফরাসীদের পারিবারিক জীবনে এই দৃঢ় বন্ধন আছে বলেই সামাজিক বিনয়-ব্যবহার তারা অল্প বয়স থেকেই শেখে। বিনা কারণে লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করাই যদি ভদ্রতার লক্ষণ হয় তাহলে সকল ফরাসীকেই ভদ্রলোক বলতে হবে; কিন্তু চেহারায় চালচলনে, কাপড়-চোপড়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ ও নাগরিকতার বিশিষ্ট ভান না-থাকলে ও কথাবার্তা বেশ কায়দাদুরোস্ত না-হ'লে যদি কেউ ভদ্রলোক না হ'ন— তাহ'লে ভদ্রলোকের অস্তিত্ব ফরাসীদেশে নেই বললেই চলে। ফরাসীদেশে গ্রাম ও শহরে এমন কাউকে দেখা যায় না যে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না, এই ব্যবহার সে পারিবারিক জীবনে ছোটবেলা থেকেই শেখে আর এই হচ্ছে তার সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে তার আন্তরিকতা। তাই ইংরাজ যখন **Thank you** বা তার অপভ্রংশ শুধু— '**kiu**' বলে তখন তার মুখে কোনো ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ফরাসী যখন **merci bien** বা **merci beaucoup** বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তখন তার মুখে যে একটা মধুর ভাব ফুটে ওঠে তা তার সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই দেখেছেন। এই আন্তরিকতা আছে বলেই ফরাসীভাষায় এখনও মধ্যমপুরুষের একবচন

অর্থাৎ tu— 'তুমি বা তুই' টি'কে আছে। ইতালীর লোকেরা ফরাসীদেশকে— le pays du compliment বলে ঠাট্টা করে থাকে। ফরাসীজাতি অন্যকে compliment দিতে জানে— আর সেটা আন্তরিকভাবেই যে দিয়ে থাকে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না।

ফরাসীরা কা'কে কীভাবে সম্বোধন করতে হবে তা জানে। তাই চিঠিতে আন্তরিকভাবে পরিচিত না হ'লে— শুধু Monsieur, বেশি পরিচিত হ'লে— Cher Monsieur, ও বিশেষ হৃদ্যতা থাকলে — Cher Monsieur Dutt পাঠ লিখবে, আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে Bien Cher Dutt পাঠও লিখে থাকে। তাই ফরাসীরা নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ব্যতীত অন্যের কথার জবাবে 'হাঁ' বা 'না' বলতে হ'লে—'Oui' বা 'Non' দিয়ে সারে না— তার সঙ্গে একটা Monsieur জুড়ে দেয়।

ফরাসীর বিনয়-ব্যবহার ও সাম্যজ্ঞানই তার জাতীয় ঐক্যের মূলসূত্র। ফরাসীদেশের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত ন'ন তাঁরা মনে করেন যে শহরে ও বাইরে ফরাসীর চরিত্র এক নয় এবং তাদের ভিতর কোনো যোগাযোগ নেই। সব ফরাসীর ভিতরই যে একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তা নয়, তাদের অনেকের উৎপত্তি-স্থান বিভিন্ন। তাই বাইরের থেকে দেখলে মনে হয় বৃটানী ও প্রভাঁস (Provence দক্ষিণ ফ্রান্স) এবং আলসাস্-লোরেন (Alsace-Loraine) ও পিরিনিজ (Pyrenees)-এর বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকখানি তফাত। আকৃতি ও চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটিতে ওইসব দেশবাসীদের ভিতরে বহু পার্থক্য ধরা পড়ে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই— কিন্তু প্রকৃতিগত একটা বড় ঐক্যও তাদের মধ্যে দেখা দেয়, সেই ঐক্যই হচ্ছে ফরাসী সভ্যতা। তাই রেনাঁ (Ernest Renan) পুরাদস্তুর বৃটন ও দোদে (Alfonse Daudet) প্রভাঁসের (Provence) লোক হয়েও ফরাসী সাহিত্যিকদের শীর্ষস্থানীয়।

অন্যান্য দেশে রাজধানী জাতীয় জীবনের যতটা কেন্দ্র হোক বা না হোক প্যারিস যে পূরামাত্রাতেই ফরাসী জীবনের কেন্দ্র তাতে সন্দেহ নেই। শুধু প্যারিসের লোকেরাই তাই ভাবে না সমস্ত ফরাসীজাতিই প্যারিসকে সেই চোখে দেখে। প্যারিস ফরাসীজাতির শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রস্থানীয়। তা ছাড়া বাইরের থেকে দেখলেও প্যারিসের ভিতরেও ফরাসীদেশের গ্রাম্যজীবনের অনেক হাবভাব চোখে পড়ে।

গ্রাম থেকে প্যারিসে এসে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরাই সে-হাবভাব বজায় রাখেন। প্যারিস যাঁরা ওপর-ওপর দেখেছেন অর্থাৎ মোঁমার্তের Montmarte) নাচঘর ও রেস্তোরাঁ, ল্যাটিন কোয়ার্টার (Quartier Latin) ও মোঁপার্নাসের (Montparnasse) কাফেগুলি দেখেই যাঁরা প্যারিস দেখার গর্ব করেন তাঁরা প্যারিসের যা সত্যকার ফরাসী জীবন তা যে দেখেন নি একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কারণ নাচ গানে ভরা এইসব কাফে ছেড়ে শহরের একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যায় যে সত্যকার ফরাসী নিঃশব্দে তার কাজ করে যাচ্ছে— তার ভিতর দিয়ে যে প্রাণ-প্রবাহ চলেছে সেই প্রবাহই ফরাসীজাতির নিজস্ব— ও সেইখানেই গ্রাম ও শহরের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ।

শহর ও গ্রামের ভিতর এই যোগাযোগ আছে বলেই ফরাসীরা প্যারিসকে লণ্ডন বা নিউ

ইয়র্ক হতে দেয় নি। রাস্তাগুলির কখনো দু'ধারে কখনো বা মাঝখানে এখনো সবুজ গাছের সার দেখা যায়— অনেক রাস্তায় এখনো ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে তার জিনিস বিক্রি করে যায়— আর জাতীয় উৎসবের দিন রাস্তার উপর এখনো নাচ গান হয়— ও সেই উপলক্ষে রাস্তার দু'ধারে যে মেলা বসে তা একমাসেও ভাঙে না।

তাই বাইরের চেহারায় সত্যকার প্যারিস বিদেশীকে বড় একটা চমক লাগাতে পারে না— ছ'তলার বেশি উঁচু বাড়ি প্যারিসে নেই— এবং দু'বছর পূর্বেও প্যারিসের সীমান্ত সাঁসিরে (St. Cyr) যখন প্রথম দশতলা বাড়ি তৈরি সুরু হয়েছিল তখন মিউনিসিপালিটিই সে-বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দেয়। প্যারিসের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কলেজ দ' ফ্রাঁস্—(College de France)। ফরাসী দেশের সবচেয়ে নামজাদা পণ্ডিতেরাই এখানকার অধ্যাপক কিন্তু তাঁরা এখনো একটা পুরানো দোতলা বাড়ির এঁদো ঘরেতেই ক্লাস করে থাকেন। প্যারিস শহরে এই বাইরের আড়ম্বরের অভাব দেখেই ইংরাজ ও আমেরিকানের মন চটে যায়, আর তারা মনে করে Paris is dirty। প্যারিসকে ভেঙে চুরে নিউ ইয়র্ক করায় ফরাসী জাতির এই অনিচ্ছার মূলে রয়েছে তার বহুদিনের সঞ্চিত সৌন্দর্যবোধ। প্যারিসের অনেক জিনিস বিদেশীর পছন্দ না হ'লেও সকলেই প্রায় স্বীকার করে যে প্যারিস সুন্দর। মিউনিসিপালিটির কমিটি নক্সা করে বড়-বড় রাস্তা ও Sky-scrapper তৈরি করে দিলেই কোনো শহর সুন্দর হয় না— শহরকে সুন্দর করতে হ'লে চাই নাগরিকের বহু শতাব্দীর মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান। সেইজন্যই প্যারিসের যে এফেল টাওয়ার (Tour Eiffel) দেখে বিদেশী বলে 'সাবাস্', ফরাসী তাকে তার কদর্য কুকীর্তি বলেই মনে করে।

প্যারিস ও বাইরের ফরাসীদের ভিতর নিকট সম্বন্ধের আর-একটা কারণ হচ্ছে তাদের কৃষি। ফরাসী দেশকে কৃষকের দেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না— কারণ নাগরিকের চেয়ে কৃষকের সংখ্যা তাতে অনেক বেশি। এই কৃষকেরা তাদের জমির ফসল ও তরি-তরকারি নিজেরাই শহরে আমদানি করে। আর শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভিতর অনেকেরই গ্রামে এক-টুক্রা জমি আছে— ছুটি পেলেই তারা গ্রামে যায়, আর বৃদ্ধ-বয়সে অবসর নেবার পর গ্রামের জমিই তাদের প্রধান অবলম্বন হয়। তা ছাড়া গ্রামের কৃষকদের ভিতর থেকেই ফরাসীদেশ অনেক বড় লোক পেয়েছে। ক্লেমাঁসোর (Clemenceaux) পিতা ডাক্তার ছিলেন বটে— কিন্তু তাঁর পিতামহ গ্রামের কৃষক— ফশের (Foch) জন্ম দরিদ্র পরিবারে — আর জোফ্রের (Joffre) পিতামাতা দু'জনেই কৃষক। জ'াঁ জরেস্ (Jean Jaures), ব্রিয়াঁ (Briand), এরিও (Herriot) প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লোকেদেরও গ্রামের দরিদ্র পরিবারেই জন্ম।

গ্রামের সঙ্গে শহরের নিকট-সম্বন্ধের আর-একটা কারণ হচ্ছে ফরাসীদেশের শিক্ষাপদ্ধতি। ফরাসীদেশে খুব কম ছেলেমেয়েরাই বোর্ডিঙে যায়। তারা শিক্ষার বয়সে সাধারণত শহরে পিতামাতার নিকটেই থাকে — আর তাঁরা যদি শহরে রেখে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হন তাহ'লে তারা গ্রামে পিতামহ-পিতামহী বা অন্য কোনো আত্মীয়ের নিকটে থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Ecole communale) পড়াশুনা করে। সাধারণত এগারো থেকে তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটায়— তার পর certificat

d'etudes নেবার পর নিজেদের পথ ঠিক করে নেয়। যাদের আরও পড়াশুনা করবার সুবিধা থাকে তারা তাই করে— নতুবা তারা কোনো কাজে লেগে যায়। ভালো ছেলেমেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে— এই বৃত্তি পেয়েই অনেকে শহরে কলেজের পড়াশুনা করতে পারে। কিন্তু শহরে এসেও গ্রামের টান তাদের কমে না— শৈশবের মধুর স্মৃতি, গ্রামের লতাপাতা ফুলফলের সঙ্গে তাদের পাতানো সম্বন্ধ ও পিতামহ-পিতামহীর বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহগ্রন্থি প্রভৃতির আকর্ষণে তারা প্রায়ই সেদিকে ছুটে যায়— এমন-কি দু'একদিনের ছুটিতেও সেই স্মৃতিকেই কতকটা জাগিয়ে তুলবার জন্য তারা শহরের নিকটবর্তী গ্রামে বেড়াতে যায়— তাই প্যারিসের প্রান্তভাগে যেসব বন আছে— বোয়া দ' বুলঙ্ (Bois de Boulogne), ভ্যারসাই (Versailles), ও ফঁতেনব্ল (Fontainbleu) রবিবারে বা অন্য ছুটির দিনে এদের কলধ্বনিতে ভরে ওঠে।

গ্রাম ও জমির সঙ্গে এই যোগ আছে বলে ফরাসীজাতি অন্য জাতির তুলনায় সুখী। কৃষিকার্যই তাদের বড় সম্বল, কলকারখানা তাদের থাকলেও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের বড় বেশি তারা তৈরি করে না— তাই প্রাচ্যদেশের বাজারের ওপর তাদের ততটা লোলুপ দৃষ্টি নেই। বিদেশের থেকে দেদার অর্থ আসে না বলেই তাদের জীবনযাত্রার খরচ অসহনীয়ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাই অন্যদেশের তুলনায় ফরাসীদেশে সকলেরই মাইনে কম। প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির সবচেয়ে বড় কর্মচারী বছরে ৫৫০০৲ ও চীফ এঞ্জিনিয়ার ৪৫০০৲ টাকার বেশি মাইনে পায় না। সৈন্যবিভাগে Marshal of France বছরে প্রায় ১৬০০০৲ অর্থাৎ মাসে প্রায় তেরো শো টাকা ও General তার অর্ধেক এবং সব বিভাগেই অধস্তন কর্মচারীরা বছরে গড়ে দেড় হাজার টাকার বেশি পায় না। তাই প্যারিসের যেসব অধ্যাপক সবচেয়ে বেশি মাইনে পান তাঁরাও মোটরকার রাখবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেন না। তাই বলে সেইসব অধ্যাপকেরা যে খুব কষ্টে দিনপাত করেন তা নয়— কারণ সপ্তাহে একবার করে তাঁরা নিজেদের সব ছাত্রকেই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে থাকেন।

* * *

ফরাসী-চরিত্রের এইসব গুণ আছে বলেই কার (Carr) সাহেবের তা ভালো লেগেছে এবং আমাদেরও তা ভালো লাগে। ফরাসী-চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বাঙালীর চরিত্রে আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ইংরাজ ও ফরাসী-চরিত্রের প্রভেদ একটি গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। গাড়িতে একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ পাশাপাশি যাচ্ছিল। দু'জনেই চুপ করে ছিল— কারণ বিনা পরিচয়ে ইংরাজ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ফরাসী বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। সিগারেটের আগুন ছিটকে পড়ে ইংরাজের ট্রাউজার পুড়ছে দেখে সে বলে উঠলো, মশায়, আপনার ট্রাউজার পুড়ছে। ইংরাজ চ'টে উঠে তার উত্তরে বললো— মশায়, তাতে আপনার কি ? অনেকক্ষণ ধরে আপনার জামার পকেট পুড়ছে সেজন্য আপনাকে কি আমি কিছু বলেছি ? এ-গল্প বর্ণে-বর্ণে সত্য না হ'লেও উভয় জাতির চরিত্র অনেকটা ওই প্রকারের। সিগারেট খাবার সময় পকেটে দেশলাই না

থাকলে ফরাসী অপরিচিতকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেশলাই চেয়ে নেয়— ইংরাজ দেশলাইয়ের অভাবে সারাদিন সিগারেট না খেলেও অপরিচিতের কাছে চাইবে না; গাড়িতে সারাদিন পাশাপাশি বসে থাকলেও অপরিচিতের সঙ্গে কথা কইবে না। কিন্তু ফরাসী তা পারে না— বাঙালীও তা পারে না। কারণ উভয়ের সভ্যতাই এখনো পুরামাত্রায় যান্ত্রিক হয় নি। কিন্তু যে-পথে আমরা চলছি ও ইউরোপের যে-জাতির হাবভাবের আমরা অনুকরণ করছি তাতে চরিত্রের সহজ ভাব হারিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাকে যে অচিরেই যান্ত্রিক করে তুলবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জীবনীপঞ্জি

১৮৯৮—১৬ নভেম্বর যশোহর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) শ্রীকোল গ্রামে জন্ম।

১৯২০—'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা' বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯২১—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে প্রফেসর সিলভাঁ লেভির নির্দেশে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণায় ব্রতী হন।

১৯২২—গবেষণার কাজে নেপাল যাত্রা।

১৯২২-২৫—ইন্দো-চীন, জাপান-যাত্রা। প্যারিসে প্রফেসর লেভির অধীনে গবেষণা; এবং সেখানে প্রথম ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনা করেন ও তার সেক্রেটারি পদে বৃত হন।

১৯২৬—ডক্টরেট উপাধিলাভ।

১৯২৮-২৯—পুনরায় নেপাল যাত্রা।

১৯৩০-৪৪—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা।

১৯৩৭—হাওড়া শিক্ষক অধিবেশনে সভাপতি।

১৯৩৮—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ব্রহ্মদেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সভাপতি।

১৯৪৩—আলিগড়ে অনুষ্ঠিত Indian History Congress-এর সভাপতি।

১৯৪৪—সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যয় ও প্রচেষ্টায় *Sino-Indian Studies* প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬—নাগপুরে অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference-এর Pali and Buddhism শাখার সভাপতি।

১৯৪৭—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে প্রথম Visiting Professor।

১৯৪৮-৫১—বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ; Director of Research Studies; Professor of Indology; হেমচন্দ্র বসু মল্লিক-প্রফেসর of Indian History।

১৯৫২—Indian Cultural Delegation-এর সভ্য রূপে চীন যাত্রা।

১৯৫৪—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

১৯৫৬—১৯ জানুআরি তারিখে লোকান্তরিত।

গ্র ন্থ প ঞ্জি

১। ভারত ও ইন্দোচীন : প্রকাশক, কুন্দভূষণ ভাদুড়ী—পুনর্মুদ্রণ বিশ্বভারতী
২। ভারত ও মধ্যএশিয়া : ভাবতী ভবন—পুনর্মুদ্রণ বিশ্বভারতী
৩। ভাবত ও চীন : বিশ্বভারতী
৪। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : ভারতী ভবন—পুনর্মুদ্রণ বিশ্বভারতী
5. *India and China*
6. *Le Canon Bouddhigue En China Les Traducteurs Et Les Traductions* :
7. *Deux Lexigues Sanskrit-Chinois*
8. *Kaula-Jnana Nirnaya and some Minor Texts of the school of Matsyendranatha*
9. *An Introduction to the Adhyatma-Ramayana*
10. *Dohakosa with Notes and Translations*
11. *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryapadas* (A comparative stuoy of the Text and Tibetan Translation)
12. *Studies in the Tantras*
13. *India and Central Asia*
14. *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*